# মহানগরী

মহানগরী। স্বর্গলোকের ইন্দ্রপুরীর নাম বৈজয়ন্তী। সেখানে অন্ধকার নাই—আলোর রাজত্ব। সেখানে দুঃখ নাই শুধু সুখ আছে। সেখানে অশান্তি নাই শুধু শান্তি আছে। সেখানে অতৃপ্তি নাই শুধু তৃপ্তি আছে। সেখানে দৈন্য নাই, পরম ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে সে পুরী। সেখানে জরামরণ নাই আছে অনন্ত যৌবন এবং অমরত্ব। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই, প্রেমের রাজত্ব, প্রীতির নিলয়, পুণ্যের পবিত্রতায় নিষ্কলুষ, পবিত্র। তাই ধ্বংস নাই ; মানুষ বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্বর্গপুর থাকবে।

এ মহানগরী মাটির বুকের উপর রচনা করেছে মানুষ। সম্ভবতঃ ওই বৈজয়ন্তীর মতই একটি পুরী রচনা করবার কল্পনায় সে সভ্যতার উন্মেষের প্রথম দিন থেকে পুরুষানুক্রমে বিভোর হয়ে আছে। ভাঙছে-গড়ছে, গড়ছে-ভাঙছে। অনিচ্ছায় ভাঙে স্বেচ্ছায় ভাঙে। প্রকৃতির মধ্যে চলে ভাঙাগড়া, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা—আকাশে ওঠে কালবৈশাখীর ঝড়, ঝড় আনে মেঘ—মেঘের বর্ষণে আসে প্রলয় প্লাবনের মত বন্যা—সেই ঝড়ে নগর ভাঙে, বন্যায় ডুবে যায়, পলিমাটি চাপিয়ে দিয়ে যায় স্তরে স্তরে। ঝড় বন্যার সঙ্গে আছে আগুন। নগরকে যে দীপমালা মানুষ পরায়—তারই আগুন লাগে, যে অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন মানুষ করে জীবনের প্রয়োজনে—সেই আগুন লাগে। আগেকার কালে আসত লুণ্ঠনকারী দস্যুদল—আসত নিষ্ঠুর অভিযানকারীর দল—তারা আগুন লাগিয়ে দিত—নগরীর মাথায় মাথায়, সম্পদভরা নগরীর ঘরে, নগর পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষ কিন্তু আবার গড়ত। এই নূতন গঠনে তার রূপ হত অভিনব, উজ্জ্বলতর। তার জীবনের আধুনিকতম আবিষ্কারকে সে কাজে লাগাত। আজকালকার অভিযানকারী আগেকার কালের মত ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে বর্শাফলকে মানুষের মুণ্ড গেঁথে দাউ দাউ করে জ্বালানো মশাল হাতে নগরে ঢুকে আগুন লাগায় না! মাথার উপরে ওড়ে এরোপ্লেন—তাই থেকে ফেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফারক বোমা—বিপুল শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়—মানুষের সাধের রচিত নগরীর ঘরবাড়ী টুকরো টুকরো হয়ে ধুলো হয়ে ভেঙে পড়ে, ইনসেণ্ডারী বোমায় আগুন লাগে। যেকালের কথা বলছি তখন অ্যাটম বম তৈরী হয় নি, যুদ্ধ তখনও লাগে নি ; সুতরাং অ্যাটম বমের কথা থাক। আগুনে পুড়ে বোমায় ভেঙে নগর ধ্বংস হয় ; মনে হয় এ আর কখনও খাড়া উঠবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর আবার মানুষ গড়ে সমৃদ্ধতর নগর। আগুনের পর আছে ভূমিকম্প—তারপর আছে মহামারী—মানুষের সৃষ্ট আবর্জনা থেকে উদ্ভব হয় মৃত্যুরোগের মহামারীতে নগর হয় জনশূন্য—খাঁ-খাঁ করে।

ইতিহাসে গল্প আছে—গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভের জন্য যাত্রাপথে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটল বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে বলেছিলেন—আনন্দ শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি—ভাবীকালে এইখানে গড়ে উঠবে এক মহানগরী। কিন্তু উত্তরকালে অগ্নিদাহে এবং জলপ্লাবনে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ অবশ্য হয় নাই। অজাতশত্রুর পত্তন করা পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের

রাজধানী হয়েছিল একদিন, সে নগর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছিল। মাটির তলা থেকে আজ তাকে খুঁড়ে বের করছে মানুষ। কিন্তু পাটলীপুত্র একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের পরে আবার পাটলীপুত্র গড়ে তুলেছিল মানুষ, মুসলমানের রাজত্বে পাটনা ভেঙেছে গড়েছে, আবার ইংরেজের আমলে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে আজ সে নূতন করে গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বর্গলোক কলকাতা মহানগরী। সমগ্র দেশের ভাবীকাল এইখানে রচিত হচ্ছে, বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এইখানেই হয় এ দেশের মানুষের ভাববিনিময়, লেনদেনের বোঝাপড়া। বিমল এ মহানগরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই সে পল্লীকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে, এইখানেই সে বাস করবে, এইখানেই তার স্থান তাকে করে নিতে হবে।

বিমল গাছতলায় একটি বেঞ্চে বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে এল এসপ্লানেড ট্রাম ডিপোয়। পিছনে স্ট্র্যাণ্ডের ওধারে গঙ্গায় জাহাজের স্টীমারের বাঁশী বাজছে। গঙ্গার ধারে মিলে ভোঁ বাজল। খিদিরপুর বেহালা আলিপুরের ট্রামগুলো আসছে বিপুল গতিতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ এবং ঘণ্টার শব্দ উঠছে। চৌরঙ্গি ধরে চলেছে বাস, মোটর, লরী; হর্ণ বাজছে, ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে। কোথাও বোধ হয় কোন হোটেলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। পার্কটার মোড়েই বিক্রী করছে ঘুগনি, দহিবড়া, পকৌড়ি, গরমভাজা বেগুনী, আলুর চপ। কাগজওয়ালারা সান্ধ্য সংস্করণ কাগজ বিক্রী করছে। কয়েকজনে রেসের বই নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে। উত্তরে সাততলা বাড়ীটার মাথার উপরে গোলকের মাথায় খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বলছে, ধর্মতলার মোড়ে গিসগিস করছে লোক; আলো ঝলমল করছে; উত্তর-পশ্চিম কোণে খাবারের দোকানটার মাথায় ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে।

—শুনুন।

ফিরে তাকিয়ে দেখেই বিমল বিরক্ত হল। বিশ-বাইশ কি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ডাকছিল। আধুনিক রুচি অনুযায়ী কাপড়চোপড় পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একটা ব্যাগ। সে তাকে ডাকছিল—শুনুন।

মেয়েটির সঠিক পরিচয় না জানলেও মেয়েটিকে সে প্রায় নিত্যই এখানে দেখে। এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য হয় তাকে নিয়ে। শুধু ওই মেয়েটি একা নয়, আরও অনেকে আসে। কালীঘাটের ট্রাম থেকে একটি মেয়ে নামে, নামে উল্কার মত গতিতে, ভিড় চিরে চলে হন হন করে। পাশ থেকে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সামনে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়ালে তবে সে দাঁড়ায়। তারপর গিয়ে ওঠে কোন রেস্তোরাঁয় অথবা ওঠে ট্যাক্সিতে অথবা ঘুরে পশ্চিম মুখে চলতে থাকে ইডেন গার্ডেনের দিকে।

বিরক্ত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি এর পরেই যে কথা বললে তাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, সে বললে—আপনিই তো বিমলবাবু?

চমকে উঠল বিমল। মেয়েটি তার নাম জানলে কেমন করে! শঙ্কিত হল সে। ব্ল্যাক-মেলিংয়ের কোন ফন্দী নয় তো? কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করে ফল কি? শত্রুই বা তার এমন কে আছে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এল। কাছে আসতেই বিমল তাকে দেখে আরও একটু বিস্মিত হল। যাকে সে ভেবেছিল এ তো সে নয়। একে কখনও দেখেছে বলে মনে হল না। মেয়েটি বললে—আপনাকে আমি রেডিয়ো আপিসে দেখেছি। আজই বিকেলবেলায় আপনি গিয়েছিলেন। আপনি গল্প পড়লেন সেখানে। আপনার নাম বললে। পড়া শেষ করে আপনি বাইরের আপিসে এসে চেক নিলেন, আপনাকে তখনই দেখেছি আমি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আমাকেই বা আপনার প্রয়োজন কিসের?

—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—বিপদ? কি বিপদ?

—কলকাতায় এসেছি আমি। আমার বাড়ী ঢাকায়। রেডিয়োতে গান করেন—ওখানে খুবই প্রতিপত্তি আছে বলে শোনা যায়—অরুণ রায়, চেনেন আপনি? চুল কোঁকড়া, খুব ফরসা রঙ।

—চিনি বৈ কি।

—তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমি অনেক বড় ফিল্ড পাব। রেডিয়োতে তিনি প্রোগ্রাম করে দেবেন—সিনেমাতে বলে দেবেন, সেখানে আমি স্কোপ পাব। আমি তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে—

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেললে—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললে—আমার কোন আশ্রয় পর্যন্ত নেই। আমি—আমি—।—আর সে কথা বলতে পারলে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—সে কি? স্তম্ভিত হয়ে গেল বিমল।

—আজ রাত্রিটার মত আমায় কোন ভদ্র-পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

বিমল একটু চিন্তায় পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না সে। মেয়েটি যার নাম করছে সেই অরুণ রায়কে সে জানে। অনেকেই জানে কলকাতা শহরে। বিশেষ করে ফ্যাশানেবল সোসাইটিতে। কখনও ধুতি-পাঞ্জাবি, কখনও সুট, কখনও পায়জামা আচকান, কখনও পাঞ্জাবি ও চুস্ত পায়জামা পরে বেড়ায়, মোটরেই দেখা যায় বেশীর ভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কিসে সে বিশেষজ্ঞ নয়। কোন্ দলে সে মেশে না। তার পাশে অহরহ কোন না কোন তরুণী বান্ধবী থাকেই। যাকে বলে আলট্রামডার্ণ। বাপ দিল্লীতে বড় চাকুরে। সম্ভবত পুত্রের যোগ্য বাপ মা। সম্প্রতি কোন বিখ্যাত শিল্পীর বাড়ীতে তাকে দেখেছিল বিমল, তার সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবিনীর পোশাকপরা এক তরুণী—পরিচয়ে জেনেছিল সে অরুণ রায়ের সহোদরা,

তাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোক সে হল অরুণের ভগ্নীপতি। কোন বিখ্যাত সমালোচকের আসরে তাকে দেখেছিল, সেখানে ছিল একটি ভিন্ন-প্রদেশবাসিনী কবিযশপ্রার্থিনী এক বান্ধবী। মেট্রো সিনেমার দরজায় দেখেছিল—সঙ্গে ছিল একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, সে নাকি ভারতীয় নৃত্যে পটিয়সী। অরুণ রায় খ্যাতিমান এবং সকল কর্মে পারঙ্গম।

মেয়েটি বললে—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

বিমল স্পষ্টই বললে—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যে কাহিনী বললেন—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কাহিনী নয়, সম্পূর্ণ সত্য। হাতের ব্যাগ খুলে সে একখানি পত্র বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন, অরুণবাবুর পত্র।

বিমল পত্রখানি হাতে নিয়েও পড়লে না, বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব? এখানে আমি একা থাকি একখানি ঘরে, খাই হোটেলে—আপনার ব্যবস্থা কোথায় করতে পারি ভেবে তো পাচ্ছি না। আপনি উঠেছিলেন কোথায়?

—হোটেলে। মেয়েটি তিক্ত হাসি হাসলে। বললে—খরচপত্র দিয়ে অরুণবাবু হোটেলে ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন। স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েও এসেছিলেন। তারপর—। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মেয়েটি। তারপর বললে—হোটেল থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসেছি।

—দেশে চলে গেলেন না কেন?

—না। দেশে আমি ফিরব না। সে বার বার ঘাড় নেড়ে তার সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত প্রকাশ করলে। দেশে আমার কেউ নেই; আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। মানুষের উপর বিশ্বাস করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। বড় অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনাকে ধরেছি। একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বললে—নইলে—নইলে—। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। তারপর বললে—সাহিত্যিকদের দুর্নামের কথাও আমার অজানা নয়। তবুও দুর্নামে তাদের ক্ষতি হয় এবং ওই অরুণ রায় কি—হঠাৎ থেমে সে এসপ্ল্যানেডের গেটটার থামের গায়ে লাগানো একখানি সিনেমার পোস্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই লোকটা—

—কে? বিস্মিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলে। কোন লোকটা?

—ওই যে পোস্টারে ছবি রয়েছে। লোকটার নাম করতেও ঘেন্না হচ্ছে আমার।

'অভিসারিকা' নামক নবতম চিত্রাবদানের পোস্টারে নায়ক রতন রায়ের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছিল। আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকায় রতন রায়কে দেখা যাবে। আগামী ২রা মার্চ ১৯৩৭ সালে শুভ উদ্বোধন হবে ছবির। দিনটি শুভদিন তাতে সন্দেহ নাই।

মেয়েটি বললে—অরুণ রায় কি ওই লোকটার সঙ্গে তাঁদের তুলনা আমি করি না। তা ছাড়া—এ সব বিষয়ে আপনার সুনামের কথাই শুনেছি। লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে ভরসা হয়। তাই অসঙ্কোচেই উপযাচিকা হয়ে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। রাত্রিটার মত কোন ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আমাকে আশ্রয় দেখে দিতে হবে আপনাকে। এরই মধ্যে

কতকগুলো গুণ্ডা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

বিমল শেষ কথাটায় চকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই বললে—আসুন। কালীঘাটের ট্রাম।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কালীঘাটের ট্রাম। সে উঠে পড়ল। পিছন পিছন মেয়েটিও উঠল। বিমল তাকে লেডিস্ সিটে বসিয়ে দিয়ে সামনের সিটটায় বসল। ১৯৩৭ সালের কথা—কলকাতায় এত ভিড় ছিল না তখন, ট্রামখানা খালিই যাচ্ছিল। সিটে বসে বিমল তার হাতের চিঠিখানা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, বললে—রাখুন আপনার চিঠি।

—না। পড়ুন আপনি। আমি চাই চিঠিখানা আপনি পড়েন।

খামখানা ঘুরিয়ে দেখে বিমল চিঠিখানা পকেটে রাখলে। মেয়েটির নাম—অরুণা ঘোষ।

## দুই

চৌরঙ্গির ভিজে পিচঢালা পথ আলোর ছটায় কালো অজগরের মসৃণ পিঠের মত চকচক করছে। পশ্চিমদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে; শীতের বাদলায় ময়দান আজ জনহীন। পূর্বদিকে ফুটপাথেও লোকের ভিড় নাই। দোকানের শো-কেসগুলি আলোকের প্রাচুর্যে ঝকমক করছে, বড়দিনের রঙীন কাগজের সজ্জা এখনও খুলে ফেলা হয় নি। ট্রামেও খুব ভিড় ছিল না। যারা ছিল তারাও সকলেই প্রায় নেমে গেল ভবানীপুরে, যদুবাবুর বাজার থেকে পূর্ণ থিয়েটারের মোড় পর্যন্ত। এদিকটায় লোকজনের ভিড় কিছুটা রয়েছে।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। অরুণা ঘোষ, মেয়েটির চিঠিতে ওই নাম লেখা রয়েছে। কি ভাবছে ও-ই জানে। অনেক উদ্বেগের পর একটা আশ্রয় পেয়ে পথশ্রান্ত পথিকের গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমনও হতে পারে, অথবা নিরাশ্রয় অবস্থার উদ্বেগে অধীর হয়ে এই অপরিচিত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে এখন তার ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার করছে স্তব্ধ হয়ে—এমনও হতে পারে। বিমল ভাবছিল। ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাবে। তার কয়েকজন সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন আছেন। একটা রাত্রির মত আশ্রয় দিতে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু—। এই সম্পদ-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিমল জীবনে দূরে রেখেই চলতে চায়। এই মানুষগুলির মনোভাব বিচিত্র, উদারতা আছে কিন্তু সে উদারতা চেষ্টাকৃত, স্বভাবস্ফূর্ত নয়, উপকার করেন কিন্তু চিরদিন মনে করে রাখেন উপকার করেছি বলে, প্রত্যুপকারেও এ শোধ হয় না; টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে শোধ নিয়েও বলে থাকেন বিপদের সময় টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম। শিক্ষাও এদের আছে—বি-এ, এম-এ, পাসও করেছে বংশধরেরা, বাড়ীর বহিরঙ্গে সাহেবীআনা প্রকট, সাহিত্য-আলোচনায়, জীবনের আচার বিচারের সমালোচনায়, নারীর অধিকার এবং নরনারীর সম্পর্কের গণ্ডী বিচারে যে সব ভাল ভাল কথা বলে থাকেন সে সব শুনে বিমলের মনে প্রথম প্রথম আক্ষেপ হত, মনে হত এঁদের

কত পিছনেই না পড়ে আছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মিথ্যাভাষণে এমন অদ্ভুত পটুত্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতি হিসাবে এ দেশের অন্য কোন শ্রেণী আয়ত্ত করতে পারে নি। মনের মধ্যে আসলে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যত সন্দিগ্ধ তত সংকীর্ণ, রঙ্গমঞ্চে কুললক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙমাখা লালপেড়ে শাড়ীপরা অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলে স্থান তাঁরা দেবেন, সমাদর করেই স্থান দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে কুৎসিত সন্দেহ, স্বভাব অনুযায়ী জেগে উঠবে তাকে স্থির সত্য বলে প্রচার করবার জন্য একমুখ অধীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। মিথ্যানিন্দাকে বিমল ভয় অবশ্য করে না কিন্তু অকারণে তার অবকাশ দিতে সে চায় না কাউকে।

হাজরা রোড পার হয়ে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াল। বিমল উঠল—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডাকলে—উঠুন। এবার নামতে হবে।

চকিত হয়ে মেয়েটি বললে—ও। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠল।

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দুপাশে অসংখ্য ছোট রাস্তা। নূতন যুগে তৈরী শহরের এক অংশে গলি পথ নেই। এ যুগে গলি পথ অচল। পিচ-দেওয়া ঝকঝকে তকতকে রাস্তাগুলি—সুপ্রশস্ত না হলেও প্রশস্ত। তারই মধ্যে একটা রাস্তা ধরে একটা ছোট পাঁচ মাথায় এসে দাঁড়াল বিমল। একদিকে একটা বিস্তীর্ণ বস্তী। প্লটের মালিকরা বাড়ী না করে বস্তী তুলে ভাড়া দিয়েছেন। হিসেব করে দেখেছেন—এতেই সুদ পোষায় বেশী।

অরুণা প্রশ্ন করলে—কোন দিকে আপনার বাসা?

বিমল পশ্চিম দিকটা অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

—ও যে বস্তী!

হেসে বিমল বললে—ওরই প্রান্তসীমায় থাকি। এই যে বস্তীর উত্তর দিকের রাস্তাটা—ওইটেই বস্তী এবং বাসার মধ্যে বাউণ্ডারী লাইন হয়ে রয়েছে। এ পাশে এই যে বাড়ীগুলো—এই সারিরই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা বাড়ীর একখানা ঘর নিয়ে থাকি আমি।

—আমাকে কোথায় রাখবেন? মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিমলের চট করে মনে পড়ে গেল তার স্বর্গত বন্ধু সাহিত্যিক রবীন্দ্র মৈত্রের নাটক—মাননীয় গার্লস স্কুলের একটা কথা। নিঃসম্পর্কীয় একটি পুরুষ ও নারী মনের জোর থাকলে—একই ঘরে ট্রেনের এক কম্পার্টমেণ্টের সহযাত্রীর মত রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রসিকতা করবার প্রলোভন ত্যাগ করলে সে। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল—সেটুকু সে গোপন করলে না, হাসিমুখেই বললে—ভাবছি সেই কথা।

তারপর বললে—আসুন।

একটু দূরে একটা কয়লার ডিপো—তার সঙ্গে একটি মুদীখানা। সেখানে গিয়ে বিমল ডাকলে—চিত্ত! সঙ্গে সঙ্গে একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

বিমলের গ্রামবাসী চিত্তরঞ্জন। বয়সে বিমলের কনিষ্ঠ—ছোটখাটো মানুষ—দেখে মনে হয় পনের ষোল বছরের ছেলে, কানে খাটো; আপন চেষ্টায় গড়ে তুলেছে এই মুদীখানা—কয়লার ডিপো। একদল লরীর মালিকের সঙ্গেও খানিকটা ভাগে কারবার আছে, নিজে

একখানা লরী ড্রাইভ করে, মাল বইবার অর্ডারও সংগ্রহ করে, তার জন্য একটা বখরা পায় সে। ভাল ঘরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নাই। প্রথম যৌবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে আর্যাবর্ত ঘুরেছে। মধ্যপথে গেরুয়া ছেড়ে ড্রাইভারি করেছিল। দেশে ফিরে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করেছিল। সে ছেড়ে—প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভারি করতে গিয়ে পেশোয়ারীদের স্মাগ্‌লিংএর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল। নূতন মাস্টার বুইক গাড়ী নিয়ে কলকাতা থেকে যেত দুর্গাপুরের জঙ্গলের মধ্যের এক গোপন আড্ডায়, সেখান থেকে মাল নিয়ে রাত্রি দুপুরে ফিরত আড্ডায়। তার পাশে বসে থাকত একজন—কোমরে ছোরা, হাতে রিভলভার নিয়ে। কপটতা প্রকাশ করলে তখন সে ক্ষমা করে না, তার জন্যে ছুরি বার করে বসে প্রকাশ্যেই এবং তার জন্যে কোন ভয় নাই তার।

চিত্তরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভিতর থেকে উত্তর দিলে—দাদা! আসুন-আসুন-আসুন। এই রাত্রে? বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে অরুণাকে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি? কি চান—?

বিমল বললে—ওঁর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। উনি বড় বিপদে পড়েছেন, রাত্রিটার জন্য তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পার?

চিত্ত অরুণার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, বললে—কিছু মনে করবেন না। কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি হোটেল উজ্জয়িনীতে ছিলেন না? এ্যাক্টর রতনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় উত্তর দিকের কোণটায়—!

অরুণার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চিত্ত বললে—ভুল হচ্ছে কি না জানি না। আমি ওই হোটেলটায় করলা সাপ্লাই করি কি না! ম্যানেজার চেয়ার টেবিল সাজবার ব্যবস্থা করছিলেন, আমার তাড়াতাড়ি ছিল—সেখানেই গেলাম। ঠিক আপনার মত—।

অরুণা এবার বললে—হ্যাঁ আমিই।

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—আপনিই! তাই তো বলি—এত ভুলই কি হবে আমার? তা হোটেল থেকে চলে এলেন কেন?

বিমল বললে—সে অনেক কথা চিত্ত। তবে উনি চলে এসেছেন—না এসে উপায় ছিল না। হঠাৎ আমায় রেডিয়ো আপিসে দেখে আমার পরিচয় পেয়ে আমায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ধরেছেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিটার মত আশ্রয় করে দিতে হবে। আমার তো ওই একখানি ঘর। অবশ্য ওঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার দোকানে থাকতে পারি।

—উঁহু। ঘাড় নাড়লে চিত্ত। বললে—কথা উঠবে। যারা ওঁকে দেখবে আপনার ঘরে, তারা নানা কথা বলবে।

বিমল বললে—আমি বলছিলাম ওকে যদি রাত্রিটার মত বউমার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও—তুমি আমার ঘরে থাক।

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—সর্বনাশ। আপনার বউমাটিকে তো জানেন না। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। ওঁর চৌদ্দপুরুষ—আমার চৌদ্দগুষ্টি আঠাশ পুরুষ—আপনার

হয়তো বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

—বাবু! ডিপোর কুলী একজন এসে দাঁড়াল।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে চিত্ত। কানে খাটো চিত্ত ছোট-খাটো প্রশ্নোত্তর ইঙ্গিতেই সেরে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। কুলীটা বললে—বাবুলোক ডাকছে।

বিমল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানে—ডিপোটার ভিতর দিকে কুলীদের ঘরে প্রায়ই চিত্ত এবং তার কয়েকজন বন্ধুর নৈশ আড্ডা বসে থাকে। এবং সে আড্ডায় চলে পান ভোজন। গোপনতা নাই, তবে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে ঘরের ভিতরেই বসে, গ্রীষ্মকালে ডিপোর করলার স্তূপের আড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় পাতে প্যাকিং কেসের টেবিল এবং কয়েকটা মোড়া ও টুল। চিত্ত এখুনি গিয়ে মদ্যপান করে আসবে—তারপর অসঙ্কোচেই ফিরে এসে ক্রমশিথিল-বন্ধন রসনায় কথা বলতে সুরু করবে। সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তা হলে ওকে আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার এই মুদীখানাতেই শোব। বুঝলে!

চিত্ত বললে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঁচ মিনিট। আমি আসছি। সে রাস্তায় নেমে পড়ল। বললে—এলাম বলে।

—কোথায় যাবে?

—আসছি।

অরুণা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমি আপনাকে বড় বিব্রত করলাম।

বিমল কোন উত্তর দিলে না। বিব্রত হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে বিনয় দেখাবার মত ঔদার্য তার ছিল না।

অরুণা বললে—আমি বুঝতে পারছি, হোটেল ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয় নি। কাল সকালে বেরিয়ে যা হয় করাই বোধ হয় ঠিক হত। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রতনবাবু যে রকম উৎপাত সুরু করেছিলেন—তাতে থাকতে ভরসা পেলাম না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী ছিল না, সম্বলের মধ্যে কয়েকগাছা চুড়ি বিক্রী করলাম দায়ে পড়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে যা থাকল তাতে অন্য হোটেলে উঠতে ভয় পেলাম। তা-ছাড়া—।

বিমলের কোন সাড়া না পেয়ে মেয়েটি আর কথা বলতে উৎসাহ পেলে না তবু মনে মনে সে আহত হল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নীরব হয়ে গেল।

চিত্ত এসে এই সময়টিতেই বললে—আসুন। একটা ব্যবস্থা করেছি।

অরুণা তাকালে তার মুখের দিকে, তার মুখ থেকে বিমলের মুখের দিকে। তার দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন ছিল। সে জানতে চাইছিল—আশ্রয় স্থানটির বিবরণ। বুঝতে চাইছিল—সে স্থান গ্রহণ করা যেতে পারে কি না!

বিমলই প্রশ্ন করলে—কোথায় ব্যবস্থা করলে?

চিত্ত বললে—পাড়াতে তিন-চারটি বিধবা বেড়ায় দেখেছেন, বেশ আপ-টু-ডেট সাজ-পোষাক করে, পাড়ার ছোঁড়ারা যাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তারা কে? কি করে তারা?

চিত্ত হাসলে। বললে—আগে বিধবা মেয়েরা কাশী যেত। লোকেও পাঠাত—খারাপ মেয়েদের, আবার যার কেউ কোথাও নাই—সে যেত কাশী, বিশ্বনাথ রক্ষাকর্তা—আর খেতেও পেত—ছত্র ছিল—মঠ ছিল। এখন আর কাশী যায় না। আসে কলকাতায়, তীর্থ বলুন তীর্থ—নরক বলুন নরক—যা খোঁজে পায়। এ বিধবা চারটি থাকে একটি বাড়ীতে—আমার বাড়ীওয়ালার বাড়ীর পাশেই এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই তাঁর বাড়ীতে দুখানা কামরা ভাড়া দিয়েছেন। ওদের একজন তাঁর নিজের লোকও বটেন। বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল আছে, দোকান থেকে কাটা কাপড় নিয়ে এসে সেলাই করে দেয়, পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরে, বালিশে ওয়াড়, টেবিল্‌ক্লথ, পর্দা তৈরী করে বিক্রী করে। আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে—আমি অর্ডার-টর্ডার যোগাড় করে দি। তাদের ওখানে গিয়ে বললাম। তা তাঁরা রাজী আছেন; তবে বাড়ীটি পাকা মেঝে আছে বস্তী হলেও। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

অরুণার চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।—না-না-না। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—বিমলদা-কে দেন ধন্যবাদ। উনি যদি সঙ্গে করে না আনতেন আপনাকে—তা হলে—। কিছু মনে করবেন না যেন। ঐ হোটেলটায় ওই এ্যাক্টর রতন-লালের সঙ্গে দেখার পর আমার বিশ্বাসই হত না—আপনি ভদ্রঘরের কি ভদ্রমেয়ে বলে। তবে উনি যখন এনেছেন—তখন আরও খারাপ দেখলেও বিশ্বাস করব আমি।

পাশের গলির মুখে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। বললে—কই চিত্তবাবু কে আসবেন?

চমৎকার দেখতে মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখ—টিকালো নাক—বেশ মর্যাদাময়ী সুশ্রী মেয়ে। তেমনি সপ্রতিভ—অরুণাকে দেখে বললে—আসুন ভাই।

বিমলের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহসই হয় নি, ইচ্ছে থাকলেও। আজকে এঁর দৌলতে সে সুযোগ হল।

বিমল প্রতিনমস্কার করলে। বললে—আপনার কথা চিত্ত আমাকে বলেছে, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যই শ্রদ্ধা করি।

## তিন

প্রকাণ্ড বস্তী। সাধারণতঃ বস্তী বলতে যা আমরা বুঝে থাকি বস্তীর আবহাওয়া বস্তীর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কল্পনা, আমাদের শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে একসঙ্গে ভয় ঘৃণা এবং রোমাঞ্চকর বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে—এ বস্তী সে বস্তী নয়। ছিটে বেড়ার এবং কাঠের ফ্রেমে গাঁথা টিনের দেওয়ালের উপর খাপরা বা টিনের চালওয়ালা বাড়ীর বসতিকে আমরা বস্তী বলে থাকি বটে, তবে এ বসতিটিকে বস্তী না বলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পল্লী

বলাই উচিত।

দালালগিন্নী হিরণবাবুর মা—এই বস্তী বা বসতি স্থাপনের মূল। তিন পাশের পাকা বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে তখন এখানে বস্তী পত্তনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন মাটির নীচের এক মুঠো ছোলার মত চাপ বেঁধে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা মেলে উঠেছিল। দালালগিন্নীর এই বাড়ীখানি দেখে সে আন্দোলনের মোড় ফিরে গেল। তাঁরা বললেন—এই ধরণের বসতি—যাকে বস্তী বলা যায় না—তা হতে দিতে আপত্তি নাই। জায়গাটির মালিকও ব্যবসায়ের মধ্যে নূতন পথ দেখলেন। খারাপ দিকটা অনেক ভেবে দেখলেন। দেখলেন, এইসব অসচ্ছল অবস্থার লোকগুলির কাছে ভাড়া আদায় করা কষ্টকর। বাকী পড়বার সম্ভাবনা বেশী। এরা আইন জানে এবং দেখায়। সমস্ত বিবেচনা করেও তিনি দালালগিন্নীর পন্থানুসরণ করলেন। কারণ আইন জানলেও এবং দেখালেও এরা অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বল। থানায় এবং আদালতে যার পয়সা আছে তার বিরুদ্ধে আইন দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। আইন এবং বে-আইন এই দুইয়ের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে সেই পথে যাতায়াতে তিনি অভ্যস্ত। এবং তার নিজের বাড়ীর সামনেই পড়বে এই বস্তী। এই বস্তীতেই একদিন এই দালালগিন্নী একটি বিধবা মেয়েকে দেখলেন। মেয়েটির নাম লাবণ্য। সন্তানহীনা—আত্মীয়হীনা—বিধবা হবার পর কলকাতায় এসেছিল অথবা শিক্ষাশ্রমে শিক্ষার্থিনী হয়ে। বৎসরখানেক থাকার পর—সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন জীবিকার্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ সেলাই করে গৃহস্থ বাড়ীর বরাত মত। দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে নিষ্টভাবেই বলেছিলেন—তাড়িয়ে দিলে কেন?

লাবণ্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্যের মুখের গঠনে দীপ্তি আছে, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ধারালো ঠোঁট, রাগ বা ক্ষোভের রক্তোচ্ছ্বাসে মনে হয় শিখার মত জ্বলে উঠছে। লাবণ্য খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—সে অনেক কথা।

দালালগিন্নী আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। তারপরও কয়েকদিন নিত্য দেখাশুনা হয়েছিল একই পথের এখানে বা ওখানে। দালালগিন্নী একই প্রশ্ন করেছেন—হেসে সস্নেহে প্রশ্ন করেছেন—কেমন সুবিধে হচ্ছে?

মেয়েটি কোনদিন বলত—হচ্ছে একরকম। কোনদিন চোখমুখ দীপ্ত করে বলত—ও সব জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন তো? কি বলব?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দালালগিন্নী প্রশ্ন করেছিলেন—কোথায় আছ আজকাল?

—প্রথম ওই কয়লার ডিপো করেন চিত্তবাবু। উনিই আমাকে এখানে একটা বস্তীতে আধাভদ্র আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন। ওই যে ওদিকে গয়লাদের বস্তী রয়েছে ওই গয়লাদের বস্তীতে রয়েছি। একটি বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ঘরসংসার পাতিয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জামাই নিয়ে থাকে, তাদের বাড়ীতেই একখানা কুঠুরী ভাড়া নিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, খুব মোটা, গলায় সোনার হার, পোষাকে বিধবা, সকালে পিতলের বালতীতে দুধ নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে কয়েকটা বড় লোমওয়ালা ছাগল। ছাগলের দুধও বেচে থাকে।

দুগ্ধব্যবসায়িনী সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সময় করে একদিন আমার বাড়ী এসো না কেন? আসবে?

—আসব না কেন? আপনার সময় হলে আজই যেতে পারি।

—কাজের ক্ষতি হবে না?

—কাজ? হাসলে লাবণ্য। বললে—ঘরে থাকতে পারি না বলেই বাইরে বেরিয়ে আসি, বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি বলে মরতে ইচ্ছে করে। ঘরে গোয়ালিনীর সংসারের ঝগড়া—অশ্লীল কথা থেকে কাঁট পর্যন্ত। বাইরে অভদ্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে পাশ ঘেঁষে যাবার ছলে মৃদুস্বরে আহ্বান—কখনও কখনও ইঙ্গিতময় স্পর্শ পর্যন্ত। কাজ পেলেও ঘরে থাকতে পারি না বলে কাজ পেয়ে হয় না, বাইরে ঘুরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি বলে কাজ পেয়েও হয় না। বলে না—চলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ—আমার সেই অবস্থা।

দালালগিন্নী তখনই তাকে নিয়ে ফিরলেন। লাবণ্য সেইদিনই এ বাড়ীতে এসেছে। লাবণ্যের ভাগ্যক্রমে তখন বাড়ীতে দুখানা ঘরের চতুর্থটা খালিই ছিল। তাই একখানা ঘর তাকে দিয়ে বলেছিলেন—আমার ঘর দুখানা তো পড়ে রয়েছে, তুমি থাক। সঙ্গতি হলে ভাড়া দিয়ো।

দালালগিন্নীর মমতা আন্তরিক। তিনি নিজে প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা করছেন—লোকচরিত্র তিনি জানেন এবং কথাবার্তা চালচলন থেকে ভালমন্দ তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে তিনি অবিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু এই দুটি কারণেই তিনি লাবণ্যকে ঘরে স্থান দেন নাই। সম্প্রতি তিনি নিজের বিধবা কন্যাটি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুরুষবন্ধুটির নিজের অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁর অবর্তমানে বধূ পূর্ণ গৃহিণীত্বে আসীন হলে মেয়ের অবস্থা কি হবে এই চিন্তা তিনি না করে পারেন না। লাবণ্যকে তিনি নিয়ে এলেন, মেয়ে অমলাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য।

মাসখানেক যেতে না যেতে লাবণ্য আর একটি বিধবা তরুণীকে নিয়ে এল, আরও কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন; তারপর কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন। তখন দুখানা ঘরই তারা ভাড়া নিলে—তারপর কিস্তীবন্দীতে কিনলে একটা সেলাইয়ের কল। ক্রমশঃ পিক্টোগ্রাফের সরঞ্জাম, পশম বোনার কুরুশকাঁটা, বাগ তৈরীর চামড়ার উপর কারুকার্য করবার সরঞ্জাম এনে মাঝখানের ঘর ছেড়ে—রাস্তার দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিলে; এর জন্য প্রচলিত ভাড়ার উপর পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে নিজে থেকেই। ক্রমে তিনজনের সঙ্গে আরও একজন এসে দল পুষ্ট করলে। দালালগিন্নীর মেয়ে অমলা ও চত্বরে থাকলেও সেও এখন এদের একজন। অমলার বড় মেয়ে রাণী বড় হয়ে উঠেছে, সেও কাজকর্মের অবসরে এখানে আসে, শেখে। কট্‌কট্, কট্‌কট্ শব্দে সেলাইয়ের কল চলে—মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলে, কাজের কথাই বেশী, মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসও চলে। তার অধিকাংশই তাদের দৈনন্দিন কক্ষপথে আগন্তুক কোন বিভ্রান্ত পথিকের হুঁচোট খাওয়া বা পা পিছলে যাওয়া অথবা দুটি বিপরীত-মুখ বিভ্রান্তে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কাহিনীকে

অবলম্বন করেই চলে। পরস্পরের প্রতি সরল বাক্যবাণও বর্ষণ করে। কখনও কখনও মৃদুহাস্য অকস্মাৎ কলহাস্যে ভেঙে পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। ঝি দরজা খুলে দেয়, লাবণ্য উঠে যায় সামনের ঘরে। সামনের ঘরখানিতে একখানি লম্বা টেবিলের উপর কিছু কিছু সব রকম কাজের নমুনা সাজানো থাকে। খানচারেক সস্তা দামের চেয়ারও আছে। আগন্তুক অধিকাংশই দোকানের লোক; দোকানদারেরাই এখন এদের কাছে জিনিসপত্র নিয়ে থাকে। লাবণ্যই বেশীর ভাগ সময় কথাবার্তা বলে। মধ্যে মধ্যে আসে চিত্ত। কখনও কয়লার দাম, মুদীর দোকানের জিনিসের দাম নিয়ে যায়। কখনও নতুন অর্ডার আনে। কখনও এমনিই এসে বলে—একটু চা খাওয়াও লাবণ্যদিদি। কখনও এসে বলে—একটা ছোকরা ঘুরঘুর করছিল। ছোঁড়াটার কান মলে দিয়েছে মহাবীর। পার্সটাও কেড়ে নিয়েছে—সে কথাটা লাবণ্যকে অবশ্য বলে না। লাবণ্যও পুলকিত হয়। কখনও চিত্ত সংবাদ নিয়ে আসে, চোরাই ছিটের থানের নমুনাও বার করে দেয়।

কখনও কখনও আসে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দুজন ভদ্রলোক, একজন প্রৌঢ় একজন তরুণ। এঁরা দুজনেই শিল্পী। ডিজাইন নিয়ে আসে। ব্লাউস, ফ্রক, সায়া, টেবিল ক্লথ, বালিসের ওয়াড়, বালিসের ঢাকা প্রভৃতির উপর কারুকার্যের নক্সার নমুনা।

অরুণা এদের মধ্যে এসে সমস্ত দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত কল চলল, গল্প চলল। আজকের গল্প সবই অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে প্রশ্ন করছিল ওরা। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলে তারা অসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলে অরুণার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। গল্প বলা এবং শোনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কাহিনী শোনা হয়ে গেল। লাবণ্যদের এই বেঁচে থাকার টিঁকে থাকার বিস্ময়কর অথচ অতি সহজ দ্বন্দ্বের কথা শুনে অরুণা প্রায় অভিভূত হয়ে গেল। সে বললে—আপনাকে দিদি বলব ভাই লাবণ্যদিদি।

লাবণ্য বললে—ইচ্ছে বলে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে ভাই সবাই সখী। প্রাণের কথা মনের কথা কারও কাছে কেউ গোপন করি না।

লাবণ্য হেসে বললে—তা হলে প্রাণের কথা বলি। আমি আপনার কাছেই থাকতে চাই।

লাবণ্য হাসলে।

অরুণা বললে—আপনার মনের কথা তো বললেন না?

লাবণ্য বললে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ ভাই। তুমি কি দর্জির কাজ নিয়ে থাকতে পারবে? আর কেনই বা তা থাকবে। লেখাপড়া জানলে আমিই কি এই নিয়ে থাকতাম?

অরুণা হেসে বললে—আই. এ পর্যন্ত পড়েছি, এ কি লেখাপড়া জানা? তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া—একটু দ্বিধা করেই বললে অরুণা—লাবণ্যদি, আপনার রূপ আছে আপনি বুঝতে পারেন না—যাদের রূপ নেই তাদের লেখাপড়া জানলেও চাকরি পাওয়ার কত কষ্ট। কালো মেয়ের সঙ্গে লোক প্রেম করতে চায় কিন্তু বিয়ে—ওরে বাপ রে—কালো মেয়ে তখন কালনাগিনী হয়ে ওঠে তাদের চোখে। বলে, ওরে বাব্বা। কি চক্রান্ত! নাগপাশে জড়িয়ে ফেলে দংশাতে চায়।

তিনটি মেয়েই হেসে উঠল। লাবণ্য হাসল না।

অরুণা বললে—ও আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি লাবণ্যদি। তবে যদি তাড়িয়ে দেন সে আলাদা কথা।

লাবণ্য বললে—ভেবে দেখ।

পরদিন সকালে উঠেছিল অরুণাই সকলের আগে। লেপের মধ্যে শুয়েই সে শিয়রের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ বোধ হয় বাদলা কাটবে। কুয়াসা জমে উঠছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আকাশে মেঘ কাটা কাটা হয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সে ভাবছিল গতরাত্রির কথা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের আবেগের ঘনত্ব অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। কয়েকদিন দুশ্চিন্তা এবং বিপদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল কাল। এখন ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা। লাবণ্যের গতরাত্রির কথাটাই তার সত্য বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন সে এই দর্জির কাজ নিয়ে থাকবে কি করে? কেনই বা থাকবে?

ঠিক এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবণ্য। স্মিত হাসিমুখে সে বললে—উঠেছ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

হেসে অরুণা বললে—হয়েছিল। শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

লাবণ্য বললে— কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম অরুণা। এখানে থাকাই তোমার ভাল। হোক না দর্জির কাজ। চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। আর তোমাকে পেলে অনেক কাজ করতে পারব। বড় বড় সাহেবী দোকানে তুমি যদি আমাদের কাজ নিয়ে গিয়ে চালাতে পার—তবে আমরাই উন্নতি করতে পারব।

অরুণা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিলে না।

লাবণ্য বললে—মতের বদল করেছ না কি?

অরুণা বললে—বিমলবাবুর সঙ্গে আজ একবার পরামর্শ করব।

লাবণ্য—ওঁকে আজ ওবেলায় এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ কর না। আমাদের এই সব দেখানোও হবে—পরামর্শ নেওয়াও হবে।

## চার

মহানগরীর প্রভাত। আজকের সকালটি কুয়াসায় ঢাকা তীক্ষ্ণ শীতকাতর।

বিমল এরই মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল; এটি তার অভ্যাস। মহানগরীর এই নূতন অঞ্চলটিতে সমাজের নবোদিত অভিজাত বা আভিজাত্যের কোঠায় নূতন প্রমোশনপ্রাপ্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। বনিয়াদী অভিজাত যাঁরা তাঁরা অনেক আগেই পুরাতন মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে বহুকাল আগেই এসে বাস করছেন। নূতন কালে ব্যবসায়ে, চাকরিতে অর্থ উপার্জন করে তার সঙ্গে নূতন কালের বাঙালী-জনোচিত সাহেবীয়ানা অর্থাৎ সস্তা মডার্ণ কালচার আয়ত্ত করে পুরানো কলকাতা থেকে সরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করছেন। উপনিবেশ স্থাপনকর্তারা অধিকাংশই প্রৌঢ়—অনেকেই পেতাবধারী; রাজা, স্যার প্রভৃতি উপাধির সংখ্যা কম—রায়বাহাদুর অনেক। ডেপুটি, ডি-এস-পি, সাবজজেরা পেতাব এবং পেনসন নিয়ে এই উপনিবেশে সমাজপতি হয়ে রয়েছেন। বাত, ডিসপেপসিয়া, এ দুটো রোগও তাঁদের মধ্যে পেতাব এবং পেনসনের মত সাধারণ। এর প্রতিকারের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হন হন করে—একলা এবং দল বেঁধে লেক থেকে আরম্ভ করে পার্ক পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণকারীর ভিড় জমে যায়। এঁদের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ নবীনেরা পার্কে পার্কে টেনিস ক্লাব করেছেন: নিখুঁত পরিচ্ছদে তাঁরাও শীতের ভোরে একদফা টেনিস খেলেন। একটু রোদ চাড়া দিলে—খাওয়াদাওয়া সেরে পার্কে আসেন অন্য দল, তাঁরা খেলেন ক্রিকেট। থলে হাতে বাজারযাত্রী গৃহস্বামীদের সংখ্যা এখানে কম। যাঁরা আছেন তাঁরা বড় রাস্তা ধরে হাঁটেন না, গলিপথে হাঁটেন; দারিদ্র্যগত মানসিক অটিলতা ব্যাধিতে অধিকাংশই এঁরা ব্যাধিগ্রস্ত। অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই বাজার করান চাকর দিয়ে, ভোজনবিলাস এবং কাঠোর হিসাবীরা বাজারে যান চাকর সঙ্গে নিয়ে। কেউ কেউ যান মোটরে, তাঁরা লেকমার্কেট ছেড়ে যদুবাবুর বাজারেই যান।

যাক এত সব কথা। আজ কুয়াসা এবং শীতের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক কম। কুয়াসার মধ্যে বিমলের কিন্তু ঘুরবার পথটা বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত সে ওঠে মহানগরীর ঘুম ভেঙে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রি অবসানে মহানগরীতে জীবনের জাগরণ-সঙ্গীত পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও শোনা যায় না, মহানগরীর নিজের ধ্বনি আছে। ধর্ম-জগতের সভ্যতায় হিন্দুরা বেদগান করতেন, ইসলাম জগতে আজান আজও ওঠে, মহানগরীর কালে—একসঙ্গে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎচালিত বাঁশী বাজাতে থাকে। গঙ্গার বুকে, খিদিরপুর ডকে, গঙ্গার কূলে কূলে এপারে ওপারে মিলে মহানগরীর বুকের মধ্যে ছড়ানো ছোট বড় ফ্যাক্টরীতে বাঁশী বাজে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীর চাকার লোহার হালের শব্দ ওঠে, ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি জেগে ওঠে, বড় বড় ট্রাক এবং মোটর বাসগুলির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ওঠে। মানুষের মধ্যে হোস পাইপ এবং মই কাঁধে ছুটতে থাকে কর্পোরেশনের উড়িয়া কর্মীর দল। রাস্তায় জল দেয়, আলো নিভিয়ে ফেরে। এ অঞ্চলে পথে গ্যাসলাইট

নাই বললেই হয়; মই কাঁধে আলো নেভানো বড় একটা দেখা যায় না।

বিমল চলতে সুরু করেছিল। সময় সম্বন্ধে খেয়াল হল—কুয়াসা কেটে সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পরার পর। ফিরবার পথে 'দাদার দোকান', রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উপরেই। এটি তার চা খাওয়ার আড্ডা। দাদা এ অঞ্চলে দোকানদার হিসাবে সর্বজন পরিচিত; স্টেশনারী জিনিসের দাম যত বেশী, চা ও খাবার তেমনি অখাদ্য কিন্তু তবু দাদাকে অবহেলা করবার উপায় নাই, কারণ দু দিকে দুশো গজের মধ্যে আর কোন দোকান নাই।

দাদা বিমলকে চেনে লেখক বলে, যথাযোগ্য সমাদরও করে, নমস্কার জানিয়ে সম্মান জানায়, ভাল দেখে চেয়ারখানা এগিয়ে দেয়, দোকানের ছোকরাদের বলে—দেখিস, নিমকী বেছে দিস, চা যেন ভাল হয়। নইলে—। হাসতে সুরু করে দাদা—হেসে বলে—নইলে দেবেন কোন লেখার মধ্যে এইসা চুঁকিয়ে—বাপস্! তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে—এ—মানে কে—যেন বলছিল, এই···বাবুকে নিয়ে কি একটা লিখেছেন!

—কই না তো! বিমল নিস্পৃহ ভাবেই বললে, সে জানে এই অন্তরঙ্গতার হেতু। এইবার এই অন্তরঙ্গতার সুযোগে মৃদুস্বরে সে বলবে—চা নিমকীর দামটা দিন তো দাদা··· রুটিওয়ালাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—টাকা কিছু শর্ট আছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের খ্যাতি দাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁচেছে। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উত্তরদিকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের মস্তবড় বাড়ী, তাঁর মোটরখানাকেও দাদা চেনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র হিসেবে ভুল বলেই সকলে বিশ্বাস করে। ও কি রকম হয়ে গিয়েছে, নইলে লিখে টাকা হয়? দাদা এগুলি শিখেছে এ অঞ্চলের অভিজাত বাড়ীর ছেলেদের কাছে। যারা নাকি শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার বালীগঞ্জী সংস্করণ। সাহিত্য-সভা করে এরা সাহিত্যিকদের সভাপতি করে সম্মান দেয়, আবেগভরে আবৃত্তিও করে—'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান', আবার দরিদ্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বলে, ভ্যাগাবণ্ডস্ লোফারস্। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে মিথ্যে গল্পও বানিয়ে ফেলে। বলে—আমাদের বাড়ী গিয়েছিল বাবার কাছে, টাকা ধার করতে। ফাদার সিম্পলি বলে দিলেন—এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি ধার নয়, একেবারে। কারণ ধার দিলে আপনি শোধ দেবেন না এবং আপনার সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব। এমনি অনেক অনেক গল্প। দাদা সেইগুলি শুনেছে এবং সুকৌশলে দামটি আগে আদায় করে নেবার এই চতুর পন্থা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে শেষ করে যদি লেখক মশাই বলেই বসেন—দামটা আজ রইল—তবে জামা টেনে ধরাটা সম্ভবপর হবে না। ধরলে, যে ছেলেরা ঐ সব গল্প করে তারাই দাদার উপর চড়াও হয়ে উঠবে। বিমল খাবারের দামটি—একটি সিকি—টেবিলের উপর রেখে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। ছোকরাটাও এনে নামিয়ে দিলে নিমকীর ডিসটা।

রাস্তা দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছেন বিখ্যাত প্রফেসার—একখানা বই বগলে নিয়েই প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। লোকের ধারে খুব মন্থর পদক্ষেপে বই পড়তে-পড়তেও তাঁকে বেড়াতে দেখেছে বিমল। পড়াটা তাঁর কৃত্রিম নয়—লোক-দেখানোও নয়—সে কথা বিমল জানে।

বাসায় ফিরে দেখলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটি গল্প লিখতে সুরু করেছে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বিমলের ভক্ত। একটি ছেলের বাপ কোন জেলার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—কলকাতায় বাড়ী আছে, অপরটি মেসে থেকে পড়ে। প্রথম ছেলেটি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত হবার জন্য সাধ্যসাধনা করে সাহিত্যিকদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসে—চায়ে খাবারে আদরে—আপ্যায়িত করেন তার মা। ছেলের চেয়েও মা অনেক বেশী সাহিত্যানুরাগিণী, রোমাঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়েন—কবিতা গল্প উপন্যাস—নাটক—সব—সব। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাও পড়েন। তাঁরও অনেক অনুরোধ আজ পর্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু বিমল আজও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ছেলে দুটিকে দেখে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রুক্ষ কণ্ঠে বললে—কি খবর?

ছেলেটি হেসে বললে—আজ ওবেলা নির্মল রায় আসছেন—আপনাকে আজ যেতেই হবে, মা বলেছেন—

সঙ্গী ছেলেটি বললে—সুনীল একটা গল্প লিখেছে—পড়বে।

বিমল বললে—তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো, পড়ে দেখব কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টেনে নিলে একটা ফাইবারের সুটকেস। এইটাই তার লেখার ডেস্ক। একসারসাইজ বুক তার উপরে রাখাই ছিল, পাশে ছিল দোয়াত এবং কলম। আজও ফাউণ্টেনপেন কেনে নাই বিমল। এদিক দিয়ে সে গান্ধীপন্থী। বিলাসের পর্যায়ে ফেলে সে ফাউণ্টেনপেনকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল লাবণ্য এবং অরুণা। স্মিত হাসিমুখে লাবণ্য বললে—লিখছেন?

বিমল মুখ তুলে তাকালে।

—একটু বিরক্ত করবো?

বাধ্য হয়ে বিমলকে আহ্বান জানাতে হল—আসুন।

সমস্ত ঘরটাই প্রায় খালি। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট—দুজন বসবার মত—পুরানো আমলের ভেলভেট-মোড়া কৌচ। এখানা চিত্ত জোর করে তাকে কিনে দিয়েছে—আলিপুরের নীলামী মালের আড়তদারদের কাছ থেকে ওই কৌচখানা আর একখানা ডেক চেয়ার।

ঘরের একদিকে তার সুটকেস আর ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরেই থাকে তার বিছানা। মেঝেতে বিছানো থাকে একখানা মাদুর, তার উপরে বসে সে লেখে।

লাবণ্য বললে—আপনি নীচে বসবেন, আমরা কৌচে বসব এ কি হয়।

বিমল হেসে বললে—নিশ্চয় হয়—আপনারা অতিথি।

—না আমরা ভক্ত।

বিমল উঠে কোণে ঠেসানো ডেক চেয়ার টেনে পেড়ে নিয়ে বসে বললে—এইবার বসুন। বলুন কি খবর?

—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

গোড়া থেকেই বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তার অস্বস্তি ঘন হয়ে উঠল। বললে—হঠাৎ নিমন্ত্রণ কেন বলুন তো?

অরুণা বললে—আমার নিজের কিছু বলবার আছে আপনাকে, লাবণ্য দিদিদের অনেক কথা আছে। তা ছাড়া আপনাকে কিছুক্ষণ পেতেও চান নিজেদের মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কথা যা আছে সে এখনই বলুন না। তার জন্য নিমন্ত্রণ কেন?

লাবণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ বললে—আমাদের ওখানে যেতে আপনার কি সংকোচ বা আপত্তি আছে?

বিমল বললে—আপত্তি নেই কিন্তু সংকোচ থাকলেও কি আপনি রাগ করবেন। ওটা যে বুদ্ধিমানের ভূতের ভয়ের মত. যুক্তিবাদী বুদ্ধি বলে—ভূত নেই যখন তখন ভূতের ভয় কেন? মন বলে আমি নিরুপায়, ভয়টা মূলোর মত দাঁত মেলে কুলোর মত কান নেড়ে—তালগাছের মত লম্বা হয়ে খোনা গলায় হুঁ-হুঁ করে হাসছে, বুদ্ধি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে।

অরুণা হেসে উঠল। লাবণ্যও না হেসে পারলে না।

বিমল বললে—আচ্ছা যাব। নিমন্ত্রণ নিলাম আপনাদের। কিন্তু কথাটা কি বলে রাখলে সুবিধা হত না? ভেবে রাখতে পারতাম।

—বল অরুণা। তোমার কথাতেই সমস্যা আছে। আমাদের কথায় সমস্যা নাই। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কথা বলব। সুখ নাই—দুঃখ। তবে দুঃখের মধ্যেও অনেক হাসির কথা আছে। সেটা চায়ের আসরেই হবে।

অরুণা বললে তার সমস্যার কথা।—কাল রাত্রে ওঁদের কথা শুনে—ওঁদের কাজকর্ম দেখে বলেছিলাম—লাবণ্যদি আমি আপনাদের মধ্যেই থাকব। লাবণ্যদি বলেছিলেন,—তুমি লেখাপড়া শিখেছ—গান গাইতে পার—তুমি এ দর্জির কাজ নিয়ে কেন থাকবে? আজ সকালে লাবণ্যদি বললেন—রাত্রে ভেবে দেখেছি তোমার এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু সকালে উঠে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে লাবণ্যদি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। এ কাজ নিয়ে থেকে কি করব?

বিমল খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল রাত্রে লাবণ্য দেবী যা বলেছিলেন, আজ সকালে আপনার মনে যা হয়েছে সেইটাই আমার মতে ঠিক।

লাবণ্যের চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্বাভাবিক দীপ্তি তার মধ্যে। অরুণা তার দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কার সঙ্গেই ডাকলে—লাবণ্যদি!

লাবণ্য উত্তর দিলে না।

বিমল বুঝতে পারলে লাবণ্যকে। সে বললে—এই মহানগরীর জীবন—আমাদের সেকালের স্বল্পে তুষ্টির জীবন নয়। মন্থর গতির জীবন নয়, দ্রুতগতির জীবন। কেরোসিন ল্যাম্পের জীবন নয়, ইলেকট্রিক লাইটের জীবন।

তারপর বললে—জানেন এককালে গান্ধীজীর আদর্শে অনুরাগী ছিলাম। ভাবতাম—গ্রামই একমাত্র সত্য, মহানগরীকে ভয় করতাম, মনে করতাম এই মহানগরেই হবে মানুষের সমাধি। আজ মনে হয়—এই মহানগরেই হবে মানুষের সাধনার সার্থকতা। সেকালে শ্মশানে যেমন হত সাধকের শক্তিসাধনার সিদ্ধি।

## পাঁচ

নিমন্ত্রণটা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হল বটে কিন্তু মনে মনে বিমল অপ্রসন্ন হল। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে এমন ভাবে চা খাইয়ে সহযোগে আলাপ করতে মন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছে। বাঙালী জীবনের এটা একটা জটিলতা। এই জটিলতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজে অত্যন্ত বেশী। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত সহজ মেলামেশা প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু এই সমাজের লেখকদের লেখাতে দেখা যায় একটি তরুণ ও একটি তরুণী কোন একটি ঘটনার সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়; আলাপ হবার অপেক্ষা। অর্থাৎ তাঁদের সমাজেও ঘি এবং আগুনের প্রবাদটা আজও সত্য। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্ককে বাদ দিয়ে বান্ধব ও বান্ধবী সম্পর্ক গড়ে তোলবার মত শিক্ষা ও রুচিকে মন দিয়ে আজও গ্রহণ করতে বাঙালী পারে নি। অথচ যে যুগে যে সভ্যতার ভিত্তিতে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে তাতে স্ত্রী এবং পুরুষকে চলতে হবে কর্মপথে সহযাত্রিণীর মত, হাঁটতে হবে একই ফুটপাথে, মিলতে হবে একই কর্মক্ষেত্রে। যুক্তির দিক দিয়ে বিমল ঐ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু মানতে পারে না। শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বন্দ্বে আজও তার সংস্কার এক্ষেত্রে প্রবলতর।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। এসে উপস্থিত হল বন্ধু নীরেন। শ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এরই মধ্যে তার স্নান আহার সব সারা হয়ে গেছে, আপিস চলেছে। কাগজ বের হবে, আর মাত্র কয়েকদিন আছে। কাজের চাপ এখন বেশী। বিমল তাকে দেখে খুশী হল। মনে মনে সে যেন তাকেই কামনা করছিল।

নীরেন ধপ করে সেই ভাঙা সোফাটায় বসে পড়ে বললে—লেখা আছে? ভাল গল্প—খুব ভাল গল্প?

—গল্প কি হবে?

—চাই। খুব ভাল গল্প।

—কেন? এ মাসে তো রমেন বসুর গল্প দেবার কথা।

একটু চুপ করে থেকে নীরেন বললে—রমেনকে তো জানিস নে। লেখা শেষ করতে পারবে না জানিয়েছে। দিতে পারবি?

একটু ভেবে বিমল বললে—গল্প একটা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখতে পারি। রমেনবাবুর একটা গল্প পড়েই লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। অভিজাত বংশ নিয়ে রমেনবাবু গল্প লিখেছেন। আমার ভাল লাগে নি, এদেশের অভিজাতের জাতকে রমেনবাবু জানেন না।

আবার একটু হেসে বললে—নীলরক্ত শব্দটা ব্যবহার করেছেন। Blue blood হয়তো ওদেশের অভিজাতদের শিরায় বয়ে থাকে, আমাদের দেশে কিন্তু নীলরক্ত চলে না।

—তবে বসে যা লিখতে। আমি রাত্রে আসব। উঠলাম।

নীরেন উঠল। বিমল খাতা-কলম টেনে বসল। কিন্তু কয়েকমিনিট পরেই নীরেন আবার ফিরল। বললে—তোকে সত্যি কথাটা বলে যাই। রমেন গল্প দিয়েছে কিন্তু সে গল্প পছন্দ হয় নি সুরেশবাবুর। আমি বললাম—বিমলকে বলে দেখতে পারি যদি বলেন। খানিকটা ভাবলেন—ভেবে সুরেশবাবু বললেন, দেখতে পার। ও পারতে পারে। ওর স্টাইল ভাল নয় কিন্তু ওর বলবার কথা অনেক আছে। তফাৎ সেইখানে।

মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী। নূতন কালের রাস্তা এবং আশপাশের জমি বাড়ীর উঠান থেকে হাত দুয়েক উচু হয়ে উঠেছে। চকমিলানো বাড়ী। দোতলার কাঠের বারান্দায় কাঠের রেলিং। পর পর তিনটি মহল। বড় হলে পুরানো আমলের ভারী আসবাব। মেঝেতে পাতা কার্পেটের পশম উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতোর দড়ির বুনানী, তারও মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। কড়ি বর্গায় দীর্ঘকাল রং পড়ে নি, বহুকালের ক্ষয়ে যাওয়া দুচারখানা কড়ি ফেটে নুয়ে পড়েছে। কতগুলো টালি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাদের জমানো খোয়ার দৃষ্টিকটু চেহারা। পলেস্তারা খসে গিয়েছে বহুস্থানেই। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে; জানালা দরজাগুলোর খড়খড়ি ভেঙেছে, কব্জা খসেছে। ওই দেওয়ালের ফাটল এবং জানালার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু-হু করে। বর্ষার রাত্রি, বাইরে মৃদু বর্ষণের সঙ্গে উতলা বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সেই বাতাস ঢুকছে ঘরে—শিসের মত শব্দ করে। কড়িতে বাঁধা লোহার শিকল এবং হুকে ঝুলানো পুরানো কালের কয়েকটা ঝাড়লণ্ঠন সেই বাতাসে দুলছে, কলমে কলমে আঘাত খেয়ে টুং টাং শব্দ উঠছে। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে শব্দ শুনে মনে হবে, কে যেন গুন্ গুন্ করে এক অতি করুণ বিষণ্ণ সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

ঘরে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প, চিমনীর মাথাটা ভাঙা এবং কালো হয়ে উঠেছে শিখার কালিতে। পুরানো আলো। কলের দোষে—পলতের জীর্ণতা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্ম শিখায় কালি উঠেছে। এত বড় হলে ওই একটা দশবাতির জোরের লালচে আলো—অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্টতার জন্ম কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘরখানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ মানুষ; খাঁড়ার মত নাক, আয়তচোখে বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি ঘুরছেন; দেহের বর্ণ পাংশু পীতাভ; কবরের পাথরের আবেষ্টনীর তলায় যে ঘাস তার রঙের সঙ্গে এ রঙের তুলনা দেওয়া যায়। লালচে দশবাতির আলো তাঁর মুখ এবং অনাবৃত হাত দুখানির উপর পড়ে ম্লান মনে হচ্ছে। মাথার চুল নাই, টাক পড়েছে; পিছনে পাশে স্বল্প-খুঁটিয়ে ছাঁটা চুল—মূর্তিটির উপর সব চেয়ে বড় মহিমা আরোপ করেছে।

বহু বিভক্ত এই বাড়ীর সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ইনি। আজই এটর্নির আপিসে গিয়ে এই

বাড়ীর বিক্রী কোবালায় সই করে এসেছেন। কিনেছেন এক মিলওয়ালা। জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি ভাঙা লোহার টুকরো কুড়িয়ে। এই বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী করবেন তিনি। ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাগ করে পাঁচতলা বাড়ী।

না বিক্রী করে উপায় ছিল না। কয়েকজন অংশীদার অনেক আগেই তাদের অংশ এঁকেই বিক্রী করেছে। অন্যদিকে তাঁদের দেনাও হয়ে উঠেছে আকণ্ঠ, চিন্তায়, তাগাদায় অপমানে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

আর কিসের জন্য কার জন্য এই ভগ্ন প্রাসাদকে ধরে রাখবেন? ছোট ভাই ব্যারিস্টার হয়ে এসে—মেম বিয়ে করে—রেস এবং মদের দেনায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বড় ছেলে জোচ্চোর, সে তার বংশের দান দেহমহিমা এবং রূপকে মূলধন করে দেশে দেশে জাল রাজা সেজে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। মেজ ছেলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করছে, ধনী পিতার একমাত্র কুরূপা কন্যাকে বিবাহ করে আত্মরক্ষা করেছে। ছোট ছেলেটার ভরসা তিনি করেছিলেন। বংশোচিত দীর্ঘ অগ্নিশিখার মত চেহারা, প্রদীপ্ত বুদ্ধি, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন—মিহিরকে দেখে তাঁর ভরসা হয়েছিল মনে। কিন্তু মিহির নেমেছে পথের ধুলোয়, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে—চীৎকার করে হেঁটে চলে সর্মঘটী মজুর-দের শোভাযাত্রার পুরোভাগে। পূর্বপুরুষদের গাল দেয়। বলে—'ইংরেজ রাজত্ব যারা কায়েম করেছিল, বিদেশী বানিয়াদের বেনিয়ানি করে, তাদের অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ, ভাঙা জাহাজের মত পুরোনো—পড়ো-পড়ো বড় বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে দেখ; তারা মরছে। তাদের জায়গা দিয়ে উঠছে—নতুন বানিয়াদের দল।'

তিনি হাসেন—বিষণ্ণ হাসি।

অক্ষম উচ্চাভিলাষী ক্রোধ! কিন্তু মিহিরের লজ্জা হয় না—ওই হতভাগা নোংরা ছোট-লোকদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াতে?

মধ্যে মধ্যে পুলিস আসে। প্রথম যেদিন পুলিস আসে মিহিরের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। চার বছর আগে দিল্লী থেকে এসেছিল এক ভারত-বিখ্যাত বাঈজী। প্রৌঢ়া বাঈজী, স্থূলতায় মেদবাহুল্যে তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি চোখ বুজে বসে এই ঘরেই গান শুনছিলেন। অল্প কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন নিমন্ত্রিত। ঝাড়লণ্ঠনে সেদিনও জ্বলছিল বিজলী বাতি। এক একটি ঝাড়ে প্রায় দুশো আড়াইশো বাতির প্রভা। তিনটে ঝাড় জ্বলছিল। বেহাগ আলাপ চলছিল। অপূর্ব সে রাগিণীর আলাপ; প্রৌঢ়া বাঈয়ের কণ্ঠের স্বরমাধুর্য, সেই মাধুর্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনার অপরূপ কারুকৌশল। হঠাৎ এল চাকর। কানে কানে এসে বললে—ডাকছেন জ্ঞাতি ভাই, পুলিস এসেছে নীচে। চমকে উঠলেন। ইচ্ছে হল চাকরটাকে গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন—বসতে বলো, গান শেষ হোক, যাচ্ছি।

হঠাৎ দমকা বর্ষার বাতাসের একটা ঝটকায় সশব্দে একটা জানালার একখানা ভাঙা কাচ

কাঠ ছেড়ে ছিটকে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলোটা। তিনি বিরক্ত হয়ে সুইচবোর্ডের স্থানটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তিন মাস আগে অর্থাভাবে ইলেকট্রিক কনেকশন কেটে দিয়েছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নীচে একটা ঘোড়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠছে। বুড়ো ঘোড়াটা আজও রেখেছেন তিনি। আর আছে ভাঙা ব্রুহাম একখানা। আস্তাবলের দরজায় তেরপলের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে ; নতুন কেনার সামর্থ্য নাই ; জলের ছাটে বাতাসের দমকায় কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। বাড়ীতে বন্দুক একটা আজও আছে। কার্টিজ নাই। থাকলে আজ ওটাকে গুলি করে মেরে নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। আজ এই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় মারতে পারতেন।

বাইরে শব্দ উঠছে সিঁড়িতে। বেশ জোয়ান মানুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শব্দ। কাঠের সিঁড়ি কাঁপছে। বুঝেছেন তিনি কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে। হ্যাঁ সে-ই। বাইরের বারান্দায় মৃদু কম্পন উঠছে। তিনি ডাকলেন—মিহির!

—বাবা! এ কি—আলো নিভে গেছে? ফস্ করে দেশলাই জ্বাললে মিহির।

তাঁর ইচ্ছা হল চীৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নয়, মুহূর্তে নিজেকে সম্বরণ করে মৃদুস্বরে বললেন—না।

—আলো জ্বালব না?

—থাক।

বিমলের লেখায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে বিমল চমকে উঠল। তার গল্পের মিহির—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তারা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মিহির তার কল্পনার মানুষ নয়। সত্যকারের মানুষ। তাদের বাড়ী তাদের ইতিবৃত্ত তার বাপও সে বাস্তব সংসারের জীবন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তার মামার বাড়ীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে যে দলের সঙ্গে একদা জড়িত ছিল, মিহির আজ সেই দলের সভ্য। পুরাতন দলের আদর্শবাদে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নেতাদের একজন ছাড়া অন্যেরা আজ নানা দলে মিশে গেছেন।

মিহির বললে—গোপেন দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কেউ ডাকলে—বিমলবাবু! সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়াল—লাবণ্য।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো কম হয়েছে। মিহির সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে।

আর কেউ আসছে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রতীক্ষা করে রইল।

লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

—বিমলদা! কাকে এনেছি দেখুন। চিত্তরঞ্জন এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এসে দাঁড়াল তার গ্রামবাসী, প্রায় সমবয়সীও, কালীনাথ—কলকাতার আই-বি অফিসার।

## ছয়

খাস বিলিতী পদ্ধতিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুকরণে তৈরী—সার চার্লস টেগার্টের হাতে গড়া—বাংলাদেশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিস বাহিনী। অদ্ভুত শক্তিশালী এবং তেমনি কার্যদক্ষ। কর্মচারীগুলির মন এবং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। কালীনাথ কেন্দ্রীয় আই-বি-তে পূর্ববঙ্গের একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। ওই জেলাটির সঙ্গে এখানকার যোগসূত্র রাখাই তার কাজ—এবং ওই জেলায় যে সমস্ত বিপ্লববাদী কলকাতায় থাকে বা আসে-যায় তাদের কার্যকলাপের সন্ধান রাখাই তার ডিউটি। ওই জেলার সঙ্গে সংস্রবহীন কলকাতার দলের কর্মীদের চেনা বা জানার কথা তার নয়। মিহির যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। দলটি ভেঙে-ভেঙে এখন অত্যন্ত একটি ছোট দলে দাঁড়িয়েছে, কর্মী হিসাবে মিহিরও নূতন, বাংলাদেশের পুলিসেরা যাকে বলে পুরনো পাপী—সে গৌরবজনক আখ্যা লাভ করতে এখনও পারে নি। মিহিরকে দেখে তবু কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বিমল মিহিরকে বললে—বলবেন আমি দেখা করব।

মিহির কালীনাথকে সন্দেহ করে নাই। সে বললে—আমাকে কিন্তু বলেছেন—সঙ্গে নিয়ে যেতে।

—কিন্তু—। বিমল একটু দ্বিধা করলে, লেখাটা শেষ করতে হবে। কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে—লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে, সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে যেখানে লাবণ্য দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালীনাথ হঠাৎ মিহিরকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম মিহির বোস না? দর্জিপাড়ার কার্তিক বোসের ছেলে?

মিহির একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীনাথ এবার প্রশ্ন করলে—ও মেয়েটি কে? উনিও বুঝি—

বিমল মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বললে—থামো কালীদা। এ ছাড়া আর কথা খুঁজে পেলে না।

চিত্ত তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমাদের পাড়ারই মেয়ে, এখানে একটি সমিতি করেছেন, কয়েকজন মিলে। তাই দেখাবার জন্য বিমলদাকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছেন।

—ডাকতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। লাবণ্য এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে সকলের সামনাসামনি দাঁড়াল।

বললে, আমি যাই। উনি তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

কালীনাথ না থাকলে বিমল এতে নিষ্কৃতি পেল বোধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো অনুভব করতো এইমাত্র। কিন্তু কালীনাথের সন্দিগ্ধ হাসির রেখা তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুললে, সে বললে—দাঁড়ান, আমি যাব আপনার সঙ্গে। ফিরে সে মিহিরকে বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যেতে পারি, যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন। মানে এঁদের এখানে চা খেয়ে যাব আমি। আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন—চা খাবেন।

মিহির একটু হেসে বললে—চলুন।

বিমল কালীনাথকে বললে—আমায় যেতে হবে কালীদা।

কালীনাথ কিছু বলবার পূর্বেই চিন্ত বললে—আপনি যান, আমি ঘরে তালা দিয়ে যাব। কালীদা একটু বসবে এখানে। আমার এখানটা তো খোলা মাঠ। এরপর খুব কাছে সরে এসে—ফিস-ফিস করে বললে—কালীদাকে একটু বিয়ার খাওয়াব।

বিমল কোন উত্তর দিল না, প্যাসেজটা অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লাবণ্য এবং মিহির তার অনুসরণ করলে।

আহারের পরিচর্যার পারিপাট্য হোটেলেও থাকে, বরং হোটেলে যে পারিপাট্য সম্ভবপর সে পারিপাট্য অন্তত কোন সাধারণ বাড়ীতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে নিষ্ঠা এবং মমতার স্পষ্ট পরিচয় মেয়েদের হাতে বাড়ীর আয়োজনে পাওয়া যায়—পারিপাট্য সত্ত্বেও হোটেলে তা পাওয়া অসম্ভব। বিমল বিস্মিত হয়ে গেল—এখানে যেন দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। টেবিলের উপরে ধবধবে সাদা চাদর, জানালাগুলিতে সাদা পর্দা, দেওয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ একখানি, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো, টেবিলের উপরেও কাচের গ্লাসে টকটকে লাল সাটিনের তৈরী ফুল, ফুলগুলির চারিপাশে সবুজ সাটিনের পাতা; দেওয়ালের কোনখানে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নাই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি শুভ্র শুচিতা যেন ঝলমল করছে ঘরখানির মধ্যে। ঘরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিমল বললে—বাঃ!

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যের মুখে।

মিহিরও বললে—সুন্দর!

লাবণ্য বললে—আধঘণ্টা সময় দিতে হবে অন্তত। খাবার তৈরী করতে পনের মিনিট, আপনারা বসুন। আমি বসলে তো চলবে না। খাবারগুলো ভেজে নিই। আমি বরং অরুণাকে পাঠিয়ে দিই। লাবণ্য চলে গেল ভিতরে।

বিমল তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল এই শুভ্রশুচি ঘরখানির একটা অংশ যেন ঘরখানাকে অঙ্গহীন করে দিয়ে চলে গেল! লাবণ্যের পরিচ্ছদের মধ্যেও এই শুভ্রতার দীপ্তি, গায়ে তার ফুলহাতা সাদা লংক্লথের ব্লাউজ, পরণে ধোয়া খান কাপড় সে যেন এই ঘরখানির মর্মকথার মত ঘরখানিকে মুখর করে সজীব করে রেখেছিল। বিমল প্রসন্ন পরিতৃপ্তচিত্ত নিয়ে বসল। মিহিরও বসল।

মিহির বললে—ইনি কে? চমৎকার রুচি।

বিমল উত্তর দেবার পূর্বে অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। বিমল তাকে সম্বর্ধনা করে বললে—আসুন।

অরুণা একটু হেসে নমস্কার করে বললে—লাবণ্যদি বললেন, আপনি চলে যাবেন এখুনি।

—হ্যাঁ। জরুরী তাগিদ রয়েছে। ইনি এসেছেন তাগিদ নিয়ে। এঁর সঙ্গেই যেতে হবে। বসুন আপনি।

অরুণা বসল না। টেবিলের প্রান্তভাগটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু চিন্তা করছে অথবা কিছু বলতে চাচ্ছে। বিমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করে, সঙ্কোচ কাটাতে সাহায্য করবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কি ঠিক করলেন?

অরুণা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। মিহির বললে—কোন কথা যদি থাকে বিমলবাবু, আমি একটু না হয় বাইরে যাই।

বিমল সঙ্কোচ অনুভব করলেও অরুণা সঙ্কুচিত হল না, তার মুখে চোখে বরং উৎসাহের একটি চকিত দীপ্তিই ফুটে উঠল; তারপরই সে বললে—পাঁচ মিনিট। মিহির বাইরে যেতেই সে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—সারাদিন আমি ভেবে দেখলাম বিমলবাবু এখানে এইভাবে আমি—। বক্তব্যের শেষ অংশটুকু সে অসম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—না। না, সে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কিন্তু কি করবেন?

অরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না? ফিল্মে কি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গান দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

—না। বিমল ঘাড় নেড়ে কায়মনোবাক্যে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললে—না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—ফিল্মে যদি ঢুকতে চান—তবে সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিলেন কেন? রতনবাবুর মত নামকরা ফিল্ম এক্টরের সঙ্গে আলাপ রাখলে—যে কোন মুহূর্তে আপনি কণ্ট্রাক্ট পেতে পারেন।

অরুণা চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল বিমল—চমকানির সঙ্গে মেয়েটির সর্বশরীর শিউরে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে গলার সাড়া জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিহির। বলল—বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম আপনাদের কথায়। বাইরে একটি লোক ঘুরছে—উঁকি মেরে আপনাকে দেখলে কয়েকবার। অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হল।

বিমলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কালীনাথের কথা মনে হল। সে কি এরই মধ্যে স্পাই লাগিয়ে দিলে তার উপর। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? এই মুহূর্তে স্পাই—? সে উঠে দাঁড়াল—বললে—কোথায়?

বেরিয়ে এসে সে দরজায় দাঁড়াল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের লোক—কিংবা তার চেয়েও কম বয়স হতে পারে কিন্তু যুবক বলা চলে না, দাঁড়িয়ে আছে। কোল-কুঁজো, শীর্ণ, পরনে ময়লা কাপড়, ময়লা একটা জামা, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া একমাথা রুখু চুল, মুখে গোঁফদাড়ি অল্প, কিন্তু তাও খোঁচা খোঁচা হয়ে বড় হয়ে শ্রীহীন লোকটিকে

আরও বিশ্রী করে তুলেছে, চোখে পুরু লেন্সের একটা চশমা—লোকটিকে দেখলেই মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভীরু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কি নাম আপনার? কি দরকার আপনার?

—কে? পিছনে ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে লাবণ্য।

বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাবণ্য এরই মধ্যে খাবারের থালা হাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সে বললে—একটি লোক আপনাকে খুঁজছে। দরজার মুখটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বিমল। খোলা দরজার পথে ওই কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটিকে দেখে লাবণ্যের মুখ প্রসন্ন হাসিতে সুস্মিত হয়ে উঠল—কয়েক পা এগিয়ে এসে সে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—পিনাকী? এস—এস!

অপ্রতিভের মত হেসে পিনাকী বললে—হ্যাঁ। নমস্কার করলে সে।

লাবণ্য তাকে প্রতিনমস্কার করলে না। আবার বললে—এস। ভেতরে এস।

—যাব? এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক।

—না-না। কথাবার্তা নয়, খাওয়া-দাওয়া। এঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। এস, তুমিও এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন সাহিত্যিক বিমলবাবু। ইনি এঁর বন্ধু। আর ইনি হলেন পিনাকী ঘোষ, শিল্পী একজন। আমাদের খুব উপকারী বন্ধু। আমাদের ফ্রক ব্লাউস বেডশীট বালিশের ওয়াড়ের ওপর ডিজাইন এঁকে দেন। ভারী চমৎকার ডিজাইন করেন। ছবিও আঁকেন খুব সুন্দর।

অপরাধীর মত পিনাকী বললে—আমার একখানা ছবি 'বঙ্গভূমি' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কিন্তু নতুন আর্টিস্টের অসুবিধে তো জানেন। মানে নতুন কিছুকে সহজে তো লোকে নেয় না। তারপর অপ্রতিভের মত হেসে বললে—খুব গরীব আমি। বেঁচে থাকতে হবে তো। তাই কমার্শিয়াল আর্ট করছি সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা কিছু কিছু ডিজাইন নেন—

লাবণ্য বাধা দিয়ে বললে—সব ডিজাইনই তো তোমার। এবার মেঘ-বিদ্যুৎ ডিজাইনটা খুব ভাল হয়েছে, খুব আদর করে নিয়েছে দোকানদারেরা।

হাসতে লাগল পিনাকী।

—বস—খাও। বসুন বিমলবাবু, আপনিও বসুন। বড় একটা থালা থেকে গরম নিমকী সে কাচের প্লেটে পরিবেশন করতে লাগল। বিমল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল পিনাকীকে। পুরু লেন্সের ভিতরে চোখদুটিকে ঠিক ঠাওর করা যায় না, তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে পীড়িত অপরিচ্ছন্ন মলিন অবয়ব এবং বেশভূষার মধ্যে একটি উদাসী অথবা উপবাসী মানবাত্মা যেন উঁকি মারছে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। বাইরের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভঙ্গির এই দীনতার জন্য লোকটির উপর ঘৃণা বা বিরক্তি অর্থাৎ একটা বিরুদ্ধ ভাব মানুষের মনে জাগবেই—তবুও লোকটির জন্য অন্তর করুণায় ভরে উঠবে।

লাবণ্য বললে—খান।

পিনাকী চোখ বন্ধ করে গব্ গব্ করে খাচ্ছে। বিমল হেসে একখানা নিমকী মুখে তুললে। লাবণ্যের একজন সহকর্মিণী একটা থালায় গরম সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এল।

লাবণ্য বললে—এ আমাদের মলিনা। বানে ভেসে চারটি কুটো আমরা চরে এসে একসঙ্গেই ঠেকেছি, মলিনা—আমাদের এক কুটো। তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে বললে—পঞ্চম কুটো আমাদের অরুণা; কিন্তু ও এখনও দুলছে, একটা চরের কুটোর সঙ্গে আটকেছে, অন্য মাথাটা স্রোতের টানে ছুটতে যাচ্ছে। কি হল?

এতক্ষণে পিনাকী চোখ খুলে অরুণার দিকে তাকালে—বললে—এঁর কথা বলছেন বুঝি? ঘাড় ঝুঁকে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে।

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। লাবণ্য বললে—পিনাকী, তোমার সহজ বুদ্ধি কখনও হবে না। এমন করে কি দেখছ তুমি?

পিনাকী বললে—দেখছিলাম, বলে সে থেমে গেল, তারপর অপ্রতিভের মত বললে—মানে, মনে হল ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আবার একটু থেমে বললে—জানেন, আমার আঁকা বিজ্ঞানের একটা ছবি আছে, খুব বিষণ্ণ মেয়ের মুখের ছবি, বন্ধ্যা মেয়ে আর কি; সেই ছবির মুখের খুব মিল আছে। তাই মনে হচ্ছিল—চেনা মুখ। আবার একটু ভেবে বললে—ছেলেবেলায় আমার এক দিদি মারা গেছেন, বিজ্ঞাপনে এসেছিল দিদির মুখ। দিদির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের মিল রয়েছে আর কি। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মত খানিকটা হাসলে সে।

এবার চা নিয়ে এল চরে ভেসে এসে লাগা আর দুটি কুটো। তাদের পিছনে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল বাড়ীর মালিক দালালগিন্নী এবং তার মেয়ে। লাবণ্য পরিচয় করিয়ে দিলে। বিমল কিন্তু কথা বাড়াল না। বললে—আজকে কথাবার্তার সুবিধে হল না। আমার জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হবে। কথার শেষে সে হাত জোড় করলে।

লাবণ্য হেসে বললে—আমাদের আর কথা কি? আপনারা মানী লোক, অনেক বড়-লোকেরা আপনাদের কথা শোনে। একটু বলে দেবেন আমাদের এখানকার কথা। একটু বিজ্ঞাপন আর কি। কথা ছিল অরুণার। ওর কথা শেষ হয়েছে?

বিমল বললে—হ্যাঁ। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা আসি। চলুন মিহিরবাবু।

সত্যই তো, আর কি বলতে পারতো বিমল। করুণার্দ্র হয়ে অরুণাকে নিয়ে ফিল্মওয়ালা বা গ্রামোফোন কোম্পানীর দোরে দোরে ঘুরতে পারতো। নিজেকে বিপন্ন করে নিজের উপার্জন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারতো যতদিন না সে নিজে উপার্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে সে নিজেকে জড়াতে পারতো অরুণার সঙ্গে। নিজের জীবনের যাত্রাপথে গতিকে মন্থর করতে হত বা সাময়িকভাবে পথের ধারে অরুণার সঙ্গে ভাগে গাছ-তলায় মুসাফেরখানা বানাতে হত। সে তা পারে না। মানুষকে চলতে হবে একা। এতকাল পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষকে আশ্রয় করে চলে এসেছে। সে এককাল ছিল, কৃষিপ্রধান

গ্রাম, পুরুষে করেছে চাষ। মেয়েরা রয়েছে ঘর, পুরুষে কেটেছে ধান—মেয়েরা ভেঙেছে চাল, রেঁধেছে ভাত, কেটেছে সুতো—পুরুষে বুনেছে কাপড়। আজ মহানগরীতে সে ধারা অচল হয়ে উঠেছে। সে ধারা ধরে চলতে গেলে মর্মান্তিক কেরানী জীবনকে অবলম্বন করতে হবে। অন্ধকূপের মত আশ্রয়ে—পাততে হবে সংসার, আলো নাই, বাতাস নাই, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, গাঁথনীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষয়রোগের জীবাণু বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তাদের; উঠানে মাটির তলবাহী নর্দমার মুখের বদ্ধ ঝাঁঝরিটায় কলেরা টাইফয়েডের বীজ; মরবে তোমার শিশু। এ পৃথিবীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে নরনারীর মিলিত জীবনের সাধের মাশুল হিসাবে। না—তা পারে না—পারবে না। সে অধিকারই নাই তার! হঠাৎ পায়ে একটা হুঁচোট খেলে বিমল।

মিহির বললে—দেখবেন, রাস্তা বড় খারাপ।

রাস্তা খারাপই বটে। বালিগঞ্জের দক্ষিণে ঢাকুরিয়ার দিকে চলেছে তারা। দুপাশে জঙ্গল, নারকেল বাগান, পুরনো বাড়ী, জবজবে জলে ভর্তি ড্রেন—কোথাও কোথাও কাঁচা। রাস্তার আলো অপর্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে ছোটখাটো দোকান,—কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। নেহাত ছোট দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপী। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালা বা ধোবাদের জটলা হচ্ছে; উড়িয়ারা ঢোলক বাজিয়ে গান করছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।

বিমল লজ্জিত হয়েছিল, নিজের কাজেই সে নিজে লজ্জা পেয়েছিল। কেন সে অরুণাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে গিয়ে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার কল্পনা করলে? ছি! জীবনের পথে চলতে কত পুরুষ কত নারীর সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো খানিকটা পথ পাশাপাশি চলতেও হবে; সে তো অনিবার্য। কথাও বলতে হবে, কথা বলতে গিয়ে সঙ্গীতের রেশও বাজতে পারে কানে, তার ফলে মিতালীও হতে পারে। তাতে কি? আবার যে দিন সে যাবে এক পথে—ও যাবে অন্য পথে—সে দিন হাসিমুখেই চলবে বিপরীত পথে। চোখে দু'এক ফোঁটা জল আসে—পড়বে ঝরে।

—দাঁড়ান। মিহির পাশে একটু এগিয়েই চলছিল নীরবে, সবল সুস্থ দীর্ঘাকৃতি তরুণ ছেলেটির পদক্ষেপে কঠিন শব্দ বেজে উঠছিল নির্জন অন্ধকার সহরতলীর পথে। সে হঠাৎ বললে—দাঁড়ান।

—কেন?

মৃদুস্বরে বললে মিহির—একখানা মোটর টর্চ ফেলে কি যেন দেখছে।

অদূরেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। পিছনের লাল আলোটাও জ্বলছে না—সুতরাং অন্যমনস্ক বিমলের চোখে পড়ে নাই। গাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ ফেলে পাশে কিছু যেন দেখছেন আরোহীরা। গাড়ীর দরজা খুলে কয়েকজন নামলেন। বিমল মিহিরকে বললে—আমি আপনাকে বলি নি, আমি একটু অন্যায় করেছি।

—কি?

—আমার বাসায় ওই যে লোকটি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করলে—ও হচ্ছে আমার গ্রামের লোক আই-বি ইন্সপেক্টার।

—আই-বি ইন্সপেক্টার? একটু চমকে উঠল মিহির।

—হ্যাঁ, আমার বোধ হয় আজ আপনার সঙ্গে আসা উচিত ছিল না। আপনাকে বিদায় করে দিয়ে, ওকে আটকে রাখলেই ভাল করতাম আমি।

মিহির বললে—না—না। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। গোপেনদা তো লুকিয়ে নেই যে পুলিশ বলো করলে কোন ক্ষতি হবে। এ তো কোন গোপন ব্যাপার নয়।

—তবে মোটর দেখে দাঁড়ালেন কেন?

মিহির হেসে বললে—প্রথমটা দাঁড়িয়েছিলাম অভ্যাসে। তারপর দাঁড়িয়েছি—যাঁরা নেমেছেন তাঁদের একজন আমার কাকা।

—আপনার কাকা?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে। আপনি তো সে জানেন। এক বছর টাইম দিয়েছে খরিদ্দার বাড়ী তৈরী করে নেবার জন্যে। সম্ভবত কাকা এসেছেন জমি দেখতে! এখানকার জমি বিক্রী হবে। ওখানে একটা সাইনবোর্ডে আছে 'ল্যাণ্ড ফর সেল'। একটু থেমে বললে—কাকার চোখে ঠিক পড়তে চাই না।

টর্চটা এগিয়ে গেল—রাস্তার পাশের পতিত জায়গাটার মধ্যে। মস্ত একটা নারকেল বাগান, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছিটে বেড়ার বাড়ী।

মিহির বললে—এইবার আসুন। গাড়ীটার এদিক দিয়ে আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া যাবে

গাড়ীটাকে পাশে রেখে একটা বাঁক ঘুরে পুরানো একতলা একটা বাড়ীর মধ্যে মিহির তাকে নিয়ে গেল। বিমলের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। গোপেন মুখার্জী প্রাচীন কালের বিপ্লবী নেতা। এককালে বিমল তাঁকে গুরু বলে পূজা করেছে। তাঁর দেখা পাবার জন্য কত ব্যগ্রতা ছিল। বাংলা দেশের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগীদের মধ্যে এমন বিরাট সাহস মাত্র কয়েকজনের ছাড়া আর কারও ছিল না। সিংহের মত সবল দেহ। খালি গায়ে—সে বিরাট বুকের পাটা—সে ক্ষীণ কটি—বাঘের মত হাতের পাঞ্জা—চশমায় ঢাকা—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, মাথায় বড় বড় চুল—তাঁর সেকালের মূর্তি স্পষ্ট মনে পড়েছে তার। একটা ঘরের মধ্যে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন তিনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে কখনও পারে নি বিমল, কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট কিন্তু কথা বলতেন মৃদুস্বরে। শেষবার সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার গ্রামে তার বাড়ীতে যাবার জন্য। তখন তিনি অ্যাবস্কণ্ড্ করে ফিরছিলেন। তার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না। কলকাতা ছেড়ে গেলে কাজ চলবে না।

মহানগরী কলকাতা ইংরেজের শক্তির কেন্দ্রস্থল; মহানগরী কলকাতা ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্মস্থল। মহানগরীর অন্তর জগতে লক্ষ লক্ষ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘাতে

কলরোল উঠছে অবিশ্রান্ত—বিপুল শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে দ্বন্দ্ব, তার আঘাত ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তে।

আজও ঠিক সেইভাবে—সেই এক কোণে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন গোপেনদা। বিমলকে দেখে একটু হেসে নীরবে হাতখানি তুলে ধরলেন নিজের সামনে—অর্থাৎ বস এইখানে।

বাঘের থাবার মত বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলেন বিমলের হাতখানি ; একটু মিষ্টহাসি হেসে গোপেনদা বললেন—বিখ্যাত লোক হয়েছ এখন—এঁ্যা ?

একটু কুণ্ঠিত হল বিমল, সে বুঝতে পারলে না গোপেনদা কি বলতে চাচ্ছেন, তবে কথার সুরের মধ্যে এবং তাকে গ্রহণের ভঙ্গিতে স্নেহের ভরসা রয়েছে ; তা ছাড়া প্রশংসা বস্তুটাই এমন যে অকুণ্ঠিত গলাধঃকরণ করা যায়, সমাজ-চলিত রীতির অভ্যাসে—নতুন বউয়ের মত মুখ নামিয়ে রক্তিম মুখে আস্বাদন করতেই হয়। বিমল একটু হেসে মুখ নামালে।

গোপেনদা বললেন—তুমি তো জান—আমি নাটক নভেল পড়ি না। তোমার লেখা আমি পড়িনি, তবে লোকে নাম করে শুনেছি ; কাগজে সমালোচনা পড়েছি। ভারী আনন্দ হয়। হঠাৎ একজন আমাকে তোমার একটা লেখা পড়ে শোনালেন।

গোপেনদা সোজা হয়ে বসলেন। কণ্ঠস্বর বেশ একটু উস্কে দেওয়া প্রদীপের শিখার মত প্রখরতর হয়ে উঠল। বললেন—গল্পটা শুনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। গল্পটার নাম আমি ভুলে গেছি। একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা পাঠশালা-পণ্ডিতের স্ত্রীকে নিয়ে গল্প।

বিমল বললে—হ্যাঁ, 'সারথি' পত্রিকায় বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেদিন তোমার সামনে পেলে আমি তিরস্কার করতাম।

বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারও বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আমার পাশের বাড়ীতে ঠিক ওই ব্যাপার ঘটে গেল। নিতান্ত দরিদ্র কেরানী-ভদ্রলোক—যক্ষ্মা হয়েছিল, স্ত্রী দেবীর মত সেবা করছিলেন, হঠাৎ একমাত্র ছেলে, তাকে ধরল ওই রোগে। গোপেনদা চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—ভদ্রমহিলা যেন পাগল হয়ে গেলেন, সেই রাত্রেই ভদ্রলোকটি মারা গেলেন। আমার সন্দেহ হয়—। গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল—খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—যখন ঘটনাটার কথা মনে হয়—তখনই তোমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে।

এর উত্তরেই বা বিমল কি বলবে ? গোপেনদা বললেন—ওই ব্যাপারেই তোমাকে ডেকেছি। ভদ্রমহিলাটি তাঁর রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিবেশী হয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তাছাড়া ভদ্রলোকটিকে বড় ভালবাসতাম আমি।

বিমল অস্বস্তিকর বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে গোপেনদা তাকে ডেকেছেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অরুণার কথা। অরুণাকে নিয়ে সে অকারণে অনিচ্ছায়

জড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি ভোগ করছে। যে জলে ডোবে সে প্রাণের আকুলতায় পাশে যাকে পায় তাকেই আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে—তার জীবনও যে যায় তাতে। বাঁচে না কেউ—ডুবে মরে দুজনেই। বিপুল শক্তির অধিকারী যে—সে-ই তীরে উঠতে পারে বিপন্নজনকে পিঠে নিয়ে।

গোপেনদা বললেন—তোমাদের গ্রামের শ্রীচন্দ্রবাবু, যিনি বালিগঞ্জেই থাকেন—তাঁর কাছে একবার যেতে হবে তোমাকে। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি আজ।

বিমল এবার আরও বিস্মিত হল। শ্রীচন্দ্রবাবু মস্ত ধনী লোক। নানা ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। বালিগঞ্জের নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

গোপেনদা বলেই গেলেন—শ্রীচন্দ্রবাবুই এই বাড়ীখানা এবং আশপাশের বাগান বস্তী সব কিনেছেন। বুঝছ তো, শহর বাড়ছে, সস্তায় জমি কিনে ব্যবসা করছেন। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের পৈতৃক বাড়ীই ছিল, তিনি বিক্রী করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে। কথা ছিল জায়গাটা ডেভেলপ করে প্লট করে বিক্রীর সময় ছোট একটা প্লট এঁদের এমনি দেবেন। দলিলে কিছু নেই অবশ্য।

হাসলেন একটু গোপেনদা। বিমল প্রশ্ন করলে—এখন বুঝি দিতে চাচ্ছেন না?

গোপেনদা বললেন—দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন তোলার পথই বন্ধ হয়ে গেছে শুনছি। শ্রীচন্দ্রবাবু নাকি আবার গোটা সম্পত্তিটাই বিক্রী করে দিয়েছেন এক লিমিটেড কোম্পানীকে। তারা নোটিশ দিয়েছে—বাড়ী ভাঙবে তারা, বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

গোপেনদা বললেন—কি ভাবছ? যেতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি? না আপত্তি নয়। তবে ভাবছি গিয়ে ফল হবে না।

—ফল হবে না? গোপেনদার চোখ দুটি অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। একটুখানি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই?

শঙ্কিত হয়ে উঠল বিমল। পুরাণে অবশ্য শোনা যায়—মদোদ্ধত ক্ষীতকলেবর বিন্ধ্য তপস্বী অগস্ত্য সম্মুখে উপস্থিত হতেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছিল, অগস্ত্য বলেছিলেন—কোটী কোটী মানুষের আলো ও বায়ুর পথরোধ করে আর মাথা তুলো না; বিন্ধ্য আর মাথা তোলে নাই। কিন্তু এ যুগে সে হবার নয়। না হলে ফল হবে সংঘর্ষ। গোপেনদা কি প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন!

বিমল বললে—আপনি যাবেন?

—কেন যাব না? সংসারে লিখিত প্রতিশ্রুতিরই দাম আছে? মুখের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নাই?

—আগে আমি যাই, আপনার নাম আমি করব। শ্রীচন্দ্রবাবু কি বলেন শুনি। তারপর প্রয়োজন হয়তো যাবেন।

একটু চিন্তা করে গোপেনদা বললেন—বেশ। তা হলে কালই খবর দেবে আমাকে।

—তা হলে আমি উঠি গোপেনদা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব। মিহির।

পাশের ঘরে মিহির বসেছিল। সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে গোপেনদা বললেন—চল।

মিহির কুণ্ঠিত হয়ে বললে—এই রাত্রেই যাবেন? কাল দিনের বেলা—

—নাঃ। চল রাত্রেই ভাল। গোপেনদা উঠে দাঁড়ালেন। আলোয়ানখানা তুলে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে বিমলকে বললেন, চল। তারপর হেসে বললেন, এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে রাত্রে কাজ করতে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশী। তবু যেন তুমি পেঁচার সঙ্গে তুলনা করো না বিমল।

বিমল বললে, আমি তান্ত্রিকের দেশের লোক দাদা। অমাবস্যায় শ্মশানে যাঁরা শক্তির সাধনা করেন তাঁদের কথা আমার কাছে অজানা নয়।

মুহূর্তে গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। উষ্ণ হাত দিয়ে বিমলের হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি।

বাসার প্যাসেজের মুখে হঠাৎ বিমলের মনে হল কালীনাথের কথা। সে বললে, দাঁড়ান দাদা।

—কেন? কি ব্যাপার?

—বলছি। আসছি আমি। হন হন করে এগিয়ে গেল সে। কালীনাথ চলে গেছে, ঘরের তালা বন্ধ। চাবি চিত্তর কাছে। সে বেরিয়ে এসে বললে, দাঁড়ান চাবিটা নিয়ে আসি।

মিহির বললে, আজ থাক বিমলবাবু। অনেক দেরি হয়ে যাবে। বসলে গোপেনদা গল্পই করবেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গোপেনদা। হেসে বললেন, ওরে শয়তান, আমি বুঝি গল্পই করি! না—না, বিমল চাবি আন তুমি

বিমল বুঝলে গোপেনদার অভিপ্রায়, সম্ভবতঃ সে ক্ষুণ্ণ হবে বলেই গোপেনদা দেরি হওয়ার যুক্তিটা উপেক্ষা করেও তার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে চাচ্ছেন। সে বললে—না গোপেনদা, মিহিরবাবু সত্যিই বলেছেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আপনার। আজ থাক।

—থাকবে?

—হ্যাঁ, অন্যদিন আসবেন। সেদিন—আপনাকে কিছু খাওয়াব। গল্প করব। চলুন আজ আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

—চল। তবে কথা রইল, খাওয়াবে। আচ্ছা কালই আসব আমি। তোমার তো শ্রীচন্দ্রবাবুর কথা নিয়ে আমার ওখানে যাবার কথা। তোমায় যেতে হবে না, আমিই আসব। মিহির মনে করে দিয়ো।

মোড় পর্যন্ত এসে গোপেনদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি বুঝিয়ে বলো শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভাল করে বুঝিয়ে বলো।

বিমল কোন উত্তর দিল না। মিহির বললে—এ আপনাদের মিথ্যে চেষ্টা হবে

গোপেনদা। কোনও ফল হবে না। আমি জানি—এদের আমি জানি।

গোপেনদা বললেন—জানি; তোরা হয়ত এদের জানিস না, আমি জানি—এই সভ্যতার এই নিয়ম। এ নিয়ম মানে আইনের কথা বলছি—সে তো শ্রীচন্দ্রবাবুরা করেনি, করেছে গভর্ণমেণ্ট; কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট জমি অ্যাকোয়ার করে তাকে ডেভেলপ করে চড়া দামে বিক্রী করছে। শহর বাড়ছে, বাড়বে, শহরের এই ধর্ম্ম। বন কেটে শহর বাড়ছে, সমুদ্রের গর্ভ পূর্ণ করে শহর বাড়ছে, বম্বেতে মেরিন ড্রাইভ তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। আবার দরিদ্র মানুষের বসতি কৃষিক্ষেত্র ভেঙে শহর বাড়ছে। কিন্তু—

সশব্দে একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গোপেনদা বললেন—আচ্ছা কাল আসব।

ট্রামে চড়ে বসলেন গোপেনদা ও মিহির। বিমল ফিরল। প্রচণ্ড শব্দ করে একখানা লরী আসছে। সরে দাঁড়াল বিমল। বড় বড় লোহার বীম বোঝাই করে নিয়ে চলেছে লরীখানা। গতির ঝাঁকানিতে লোহাগুলো সশব্দে নড়ছে সেই জন্য এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। বাড়ী তৈরী হবে, লোহার কড়ি চলল। মহানগরী প্রসারিত হচ্ছে। বন জঙ্গলে ঘেরা দরিদ্রের পল্লীভবন ভেঙে তৈরী হবে দীপমালার উজ্জ্বল—আরামের উপকরণ-সমৃদ্ধ—শ্রীসম্পদে ঝলমল পুরী।

চীৎকার করছে—কে?

হৈ-হৈ চীৎকার উঠছে। কি হল? বিমল চমকে উঠল এবার। কেউ যেন ছুটে আসছে।···ছুটে গেল একটা লোক। তার পিছনে বিশ-পঁচিশ জন লোক ছুটছে। খুন—খুন। ছোরা মেরেছে। ছোরা।

মহানগরীর রাত্রি। এমন একটি রাত্রিও বোধ হয় মহানগরীর ইতিহাসে নাই যেদিন মানুষের দেহের তাজা রক্ত মাটির বুকে না পড়ে।

চাবি নেবার জন্য সে চিত্তর ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল। চিত্তর ডিপোতেই লোক জমে রয়েছে।

—কি ব্যাপার চিত্ত? খুন?

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—বেঁচে গেছে। হাত দিয়ে আটকেছিল—হাতে লেগেছে। লাবণ্যদির বাড়ীতে এক ছোকরা, ছবি আঁকে, পাগলাটে ধরন, অতি গো-বেচারা লোক, বেঁচে গেছে খুব।

এবার নজর পড়ল, সেই শিল্পী পিনাকী বসে আছে হাতখানা ধরে, একজন তুলো দিয়ে বাঁধছে।

## আট

মহানগরীর ইতিকথায় ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। স্বাভাবিকও বটে, যে ভাবের ব্যবস্থায় মহানগরীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে স্বাভাবিক বললে সত্যই বলা হবে, মহানগরীর অপমান করা হবে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক ভাবে।

পিনাকী বিদায় নিচ্ছিল লাবণ্যদের কাছে। এক লাবণ্য ছাড়া পাগল পিনাকী অপর মেয়েগুলির কাছে কৌতুকের মানুষ। সদাই অপ্রস্তুত হতভম্ব শিল্পীটিকে বেশী করে অপ্রস্তুত করে মেয়েরা আমোদ পায়। পিনাকী বাইরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছিল—মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। লাবণ্য ছিল ভিতরে। অরুণাও এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কথা হচ্ছিল সমাজব্যবস্থা নিয়ে। সমাজসম্বন্ধে কথা হলেই ক্ষেপে ওঠে পিনাকী। শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে ওঠে, তার মুখ চোখের ভীরু ভাব কেটে যায়, সে তার মাথার বড় বড় চুল অধীর ভাবে টানে এবং সমাজকে ভেঙ্গে ফেলবার শপথ গ্রহণ করে। সেই সুযোগে মেয়েরা কেউ বিধবা বিবাহের কথা তুলে দেয়। অর্থাৎ সকলেরই ধারণা পিনাকী লাবণ্যকে ভালবাসে। মেয়েদের ঐদিক দিয়ে একটা সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে কোন পুরুষের দৃষ্টি কাকে দেখে রঙীন হয়ে উঠছে। লাবণ্যকেও এ নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে পরিহাস করে থাকে কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে পরিহাস জমে না। তার সহজ গাম্ভীর্যের স্পর্শে এসে তটের উপর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেঙে নেমে যাওয়ার মত মিলিয়ে যায়। এই কারণে পিনাকীকে নিয়েই তারা একটু বেশী করে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তার ওপারের বাজারটার পিছন দিকের নিম্নস্তরের বস্তীর ভিতর থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এদের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভদ্র বেশভূষা, চলার ভঙ্গিতে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য। ওরা ওই বস্তীর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। লাবণ্য-ও এদের একটু একটু চেনে। এ পাড়ার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে বিরক্ত করে থাকে। দেখা হলেই খানিকটা পিছু নিয়ে চলে; কখনও শিস্ দিয়ে ওঠে, কখনও অকস্মাৎ চোখ পড়লে ইঙ্গিত করে থাকে। লাবণ্য এদের দেখলে, যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর না হয় সে ক্ষেত্রে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পথ চলে। খানিকটা অনুসরণ করেই ওরা ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। লোক দুটি পেশাদার গুণ্ডা নয়, কাজ-কর্ম করে, কিন্তু মহানগরীর জীবনধারায় সঞ্চারিত এই ব্যাধির বিষে জর্জরভাবে সংক্রামিত। ওদের ধারণা লাবণ্যদের ধরনের অভিভাবকহীন মেয়ে—যাদের ভরণপোষণের ভার নেবার কেউ নাই, জীবিকার দায়ে যারা এমন পথে পথে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনও ভালো মেয়ে হতে পারে না। স্বাধীনভাবে মেয়েদের জীবিকা উপার্জনের একটি পথই তাদের চোখে পড়ে। সে এই পথ। তারা জানে মেয়েদের মূলধন একমাত্র দেহ। দেহের শক্তিতে মেয়েরা ভাত রান্না করে, ঝিয়ের কাজ করে, দিনমজুরী খাটে অথবা দেহ ভাঙ্গিয়ে তারা জীবিকা উপার্জন করে। বি-এ, এম-এ, পাস করে যারা চাকরি করে খেটে খায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। এ ছাড়া অপর কোনরকম বুদ্ধিগত পন্থায় মেয়েরা জীবিকার্জন করতে পারে এ ধারণা তাদের নাই। এটা শুধু তাদের মন্দত্ব ঢাকবার ছদ্মাবরণ। স্নো ক্রীম পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক রূপকে ঢেকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতই এই জীবিকার্জনের চেষ্টাটা তাদের মন্দত্ব ঢাকার একটা পালিশ বা প্রলেপ।

আজ এই সন্ধ্যায় অভিসার-রাগময় সময়ে মেয়েগুলিকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে এব

পিনাকীর সঙ্গে চপলপরিহাসমুখর অবস্থায় দেখবামাত্র তাদের মনে হল আজ তারা এদের চাতুরী ছলনা ধরে ফেলেছে। তারা মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেই সরাসরি এসে পিনাকীর পিছনে দাঁড়াল। মেয়েগুলি চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল এতক্ষণ, সে প্রশ্ন করলে—কে? কে আপনারা? কি চান?

একজন হেসে বলে উঠল—আজ তো ধরে ফেলেছি বাবা।

অপরজন হেসে উঠল। পিনাকী সবিস্ময়ে এদের দিকে ফিরে দাঁড়াল হাসির শব্দ শুনে এবং লাবণ্য ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে অরুণা?

—দু'জন লোক।

—লোক? লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চান এখানে?

—তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। শীর্ণ কৃশদেহ পিনাকী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল!

মুহূর্তে লোকটির হাতে ছুরি ঝলকে উঠল, ছোরা নয়, স্প্রিং-দেওয়া পিতলের বাঁটের ছুরি। স্প্রিং টিপলেই ফলাটা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। লাবণ্য হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টেনে নিলে পিনাকীকে, পিনাকী হাত তুলেছিল আত্মরক্ষার জন্য, সেই হাতে ছুরিটা গেল বিঁধে। এর পরই লোক দুটো পালিয়ে গেল।

বিমল বিস্মিত হয়ে গেল পিনাকীর এমন সাহসের পরিচয় পেয়ে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হাসতে লাগল। বললে—এসব লোকগুলো এমনিই হয়। যে কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়। আমি দেখেছি, ওদের জানি আমি।

—জানেন? সবিস্ময়ে চিত্ত বললে—জানেন ওদের আপনি?

—হ্যাঁ। আরও বারদুয়েক ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একবার পিঠে ছুরি মেরেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে পিনাকী বললে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ধারে গাছগুলোর তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে—সেই রাস্তার উপর। পিঠে দাগ আছে এখনও। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। সাহস করে দাঁড়ালেই ওরা ভয় পায়, পালায়। সন্ধ্যের অন্ধকার ছিল নইলে বোধ হয় ছুরি মারতে পারত না। এমনিই ভয়ে পালাত।

চিত্ত হেসে বললে—পালায়। কিন্তু ছুরি বসিয়েও দিয়ে যায়। আপনার তো এই তালপাতার সেপাইয়ের মত শরীর, সেবার পিঠে ছুরি খেয়ে বেঁচেছেন—এবারে খুব ফস্কে গিয়ে হাতে লেগেছে কিন্তু এরপর বুকে পিঠে বিঁধে হাসপাতালে যাবার সময় হবে না। এ রকম গোঁয়ার্তুমি আর করবেন না। শুধু হাতে এগুবেন না। আমিও অবিশ্যি দুর্বল মানুষ কিন্তু হাতিয়ার আমার সঙ্গে থাকে। ওটি না নিয়ে আমি এক পা বাড়াই না।

তারপর সে আক্ষেপ করে বললে—লোকটাকে চড় না মেরে যদি চীৎকার করে ডাকতেন

মশায়! আঃ! এই তো প্রায় দোরের কাছে বললেই হয়। হারামী দুটোকে আজ আঃ! বসে আছি আমরা—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে দৌড়ে পালাল।

—চিত্তদা।

—কে? লাবণ্যদি? চিত্ত ডিপোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর। লাবণ্যই। লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে—পিনাকীকে আজ মেসে ফিরতে দেবেন না। আমি বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপোতেই একটু জায়গা করে যদি—

—ডিপোতে? এখানে তো কুলীরা থাকে, চারিদিকে কয়লা আর কালি—

—না, না। আমি বেশ চলে যাব। আপনি কিছু ভাববেন না। পিনাকী উঠে দাঁড়াল ব্যস্ত হয়ে।

—না। দৃঢ়স্বরে বললে লাবণ্য। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত আধ-কানা আধ-পাগলা মানুষ, পথে যদি লোক দুটো কোথাও লুকিয়ে থাকে—কি? না। যাওয়া হবে না তোমার। এখানে অসুবিধা হলে বিমলবাবুর ওখানে থাকবে, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

বিমল বিস্মিত হয়ে নিস্তব্ধ বসে ভাবছিল পিনাকীর কথা। অপ্রতিভ নিষ্প্রভ এই জীর্ণদেহে পিনাকীর এই সাহসটা কি? চিত্তর শরীর এমনি দুর্বল কিন্তু জীবনে এমন আবেষ্টনীর মধ্যে সে পড়েছে যে এই দুঃসাহস তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাধির মত। ক্ষেত্র ছিল অনুকূল। শিক্ষার অভাব, নেশায় আসক্তি, দুর্দান্ত লোকদের সাহচর্য দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় বাতাসের সাহায্যে শুকনো কাঠের আগুনের মত। কিন্তু পিনাকীর এ দুঃসাহস কি করে হল?

লাবণ্যের কথা শুনে সে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললে—আমি এখানেই রয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই রাত্রে পিনাকীবাবুর যাওয়া ঠিক হবে না। উনি আমার কাছেই থাকবেন। তবে—একটু লজ্জিত ভাবেই বলল—ওঁর জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মানে আমি তো পাইস হোটেলে খাই।

—হাঁ—হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

পিনাকীর জামা কাপড় অপরিচ্ছন্ন ময়লা, একটা দুর্গন্ধও তাতে আছে কিন্তু পুলওভার এবং সার্টটা খুলতেই এমন দুর্গন্ধ অনুভব করলে বিমল যে মনে হল তার বমি হয়ে যাবে এখনি। পিনাকীর গায়ের গেঞ্জিটার দুর্গন্ধ এতক্ষণ জামা দুটোর তলায় চাপা ছিল। অসংখ্য ছিদ্রভরা প্রায় রান্নাঘর নিকানো ন্যাতার মত ময়লা এবং চটচটে একটা গেঞ্জি। বোধ হয় নতুন কিনে পরেছে, আজও কাচা হয় নি, এক দিনের জন্যও গায়ের থেকে নামে নি। কিন্তু বলবেই বা কি করে?

বিছানার উপর বসে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে খুব আরাম করে বিড়িটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ বললে—আপনি বেশ আরামে আছেন, চমৎকার ঘরখানি। ছোট্ট, বেশ ঝকঝকে তকতকে—তেমনি নির্জন। I am monarch of all I survey—একলা ঘর না হলে লেখা কি ছবি আঁকা হয়?

বিমল বললে—কিছু মনে না করেন তো একটি কথা বলি।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না যেন।

অপ্রতিভ নির্বোধের মত তার মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী বললে—মনে করব কেন ? কি মনে করব ?

একটু ইতস্তত করে বিমল বললে—গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন গা থেকে। বড়—

—হ্যাঁ—বড্ড দুর্গন্ধ। অপ্রতিভের মত পিনাকী গেঞ্জিটা টেনে নাকের কাছে তুলে শুঁকলে—বড্ড দুর্গন্ধ। ছিঁড়েও গেছে। মানে একটাই গেঞ্জি কি না। ওটা আর কাচা হয় না। বলতে বলতেই সে খুলে ফেললে গেঞ্জিটা। তারপর একবার ভাল করে দেখে আর একবার শুঁকে বললে—এটাকে তাহলে ঘরের বাইরে রেখে দি। সে উঠে বাইরে রেখে এল গেঞ্জিটা—দরজার ওদিকে সিঁড়ির উপর।

বিমলের কোন কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে বিস্ময়ে বেদনায় বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল—পিনাকীর দেহ দেখে। পাঁজরার প্রতিটি হাড় গোণা যায়, বোধ হয় ভাল করে লক্ষ্য করলে—হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনিও দেখা যাবে চামড়ার উপর। শুধু তাই নয়—পিঠে একটা সাংঘাতিক ক্ষতের চিহ্ন—যেন দগদগ করছে।

পিনাকী ফিরে বিছানার উপর বসে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে তার দৃষ্টির অর্থ। হেসে বললে, আমার শরীর দেখছেন ?

—আপনার শরীর এত খারাপ !

—এত খারাপ ছিল না আগে। অপ্রতিভের মত হাসলে পিনাকী,—ওই পিঠে ছোরা মেরেছিল—তারপর থেকেই শরীরটা বেশী খারাপ হয়ে গেল। মানে আর সারাতে পারলাম না। আমার ছবি একেবারেই কেউ নিতে চায় না ! ভাগ্যিস লাবণ্যদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—উনিই আমার বড় খরিদ্দার। দশ টাকা বারো টাকা মাসে পাইগুঁর কাছে।

—পিঠে ওই দাগটা বুঝি সেই ছোরার দাগ ?

—হ্যাঁ। আর খানিকটা ঢুকলে বাঁচতাম না। ডাক্তাররা বললে। হাসতে লাগল পিনাকী।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রশ্ন করলে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ওপাশে গাছের তলায়. সন্ধ্যের সময় যান কেন ? জায়গাটা তো খুব ভাল নয়।

—না। জায়গাটা খুব খারাপ। তবে ওখানে সূর্যাস্তের সময় ফোর্টের ছবিটা খুব ভাল লাগে। গরমের সময়, ওখানে গাছতলায় বসে সূর্যাস্ত দেখে বসেই ছিলাম। ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম ! হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা শব্দ শুনে। কেউ যেন আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কেউ যেন বললে—চুপ। চেঁচালে জান মেরে দেব। আমি লাফিয়ে উঠে গাছের ওপাশ থেকে এসে লোকটার ঘাড় চেপে ধরলাম। লোকটা ঝাঁকি মেরে ফেলে দিলে আমাকে। আমি উপুড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে পা চেপে ধরলাম। অন্য লোকটি চীৎকার করতে লাগল ; এ লোকটা আমার পিঠে ছোরা মারলে।

একটু থেমে শার্টটা তুলে পকেট খুঁজলে পিনাকী; দুটো পকেটই খুঁজলে, বললে—এ হে—বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

—সিগারেট খান। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে বিমল।

—সিগারেট আমার পোষায় না দাদা। বিড়ি না হলে গলায় সানায় না।

—চুরুট আছে, খাবেন?

—চুরুট? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকীর;—ওঃ—জীবনের বিলাসকামনার মধ্যে ওইটে একটা। চুরুট খাব আমি। বুঝলেন?

স্যুটকেস খুলে চুরুট বার করতে গিয়ে বিমল একটু ভাবলে—তারপর চুরুটের সঙ্গে একটা নতুন গেঞ্জি বার করে পিনাকীর হাতে দিলে, বললে—শীতকাল, খালিগায়ে রাতে শীত করবে। এটা পরে ফেলুন। আর এই নিন চুরুট।

—নতুন গেঞ্জি! খুব নরম। এটা গায়ে দেব?

—হ্যাঁ গায়ে দিন—চুরুটটা ধরান।

—আপনি আমাকে—আপনি বলবেন না। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে বললে—আজকের দিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। বুঝলেন? চিরকাল মনে থাকবে। লাবণ্যদি এত স্নেহ করলেন, নিজের হাতে বিছানা করে দিয়ে গেলেন, আপনি গেঞ্জি দিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হল, তারপর এই চুরুট। আমার বিছানাটা খুব ময়লা আর খুব শক্ত—চমৎকার বিছানাটি।

বিমল উঠে আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছিল। পিনাকী বললে—আর একটু থাক। চুরুটটা খেয়ে নি। ধোঁয়া না দেখতে পেলে আরামটা পুরো হবে না। গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব তবে তো!

পিনাকীই উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

বিমল তখনও ভাবছিল পিনাকীর কথা। পিনাকীর মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। হয়তো আতঙ্ক অনুভব করার স্নায়ুশিরাগুলি দুর্বল, অথবা ওর রক্তের ধারার মধ্যে একটা দুর্দান্তপনার সূক্ষ্ম স্রোত প্রবহমাণ রয়েছে। হয়তো সেটা অপরাধপ্রবণতাও হতে পারে।

—ঘুমালেন দাদা?

—কিছু বলছেন?

—এই দেখুন। আবার আপনি বলছেন?

হেসে বিমল বললে—অভ্যেস হয় নি এখনও। কিছু বলছ?

—আর একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জীবন—কিই বা জীবন! তাতে বলবার মত, স্মরণ করবার মত দিন আর আসবে কি করে? কিন্তু এসেছিল একটি দিন! সে দিনটির মত দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলাণ্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে। আমি ঢুকে পড়েছিলাম, এক কোণে বসেছিলাম। মহাত্মাজী বলছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে, বুঝাতে গিয়ে বললেন—

বুঝলেন দাদা, থম থম করছে সমস্ত আসরটা—আস্তে আস্তে গান্ধীজী কথা বলছেন, সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছে, অনেকের মনে বিরুদ্ধ যুক্তি ধারালো ছুরির মত উঁচিয়ে উঠে ঝকঝক করছে, তাঁদের চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ছোট, ভুরু কপাল উঠেছে কুঁচকে; ওঃ সে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—আমার অহিংসা দুর্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি নির্ভয়ে দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তার দিকে তাকাব। আমার বুকটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠল। মনে হল মৃত্যু বুঝি খুব কাছে—হয়তো আমারই পাশে—কিম্বা গান্ধীজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। শরীরের রোঁয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমলের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে কথা বলতে পারলে না। পিনাকী বললে—ওই কথাটি রোজ আমার মনে পড়ে! জানেন—এই যে দুবার ছুরি খেলাম, দুবারই আমার মনে পড়েছে কথাটি।

ভোরবেলা দরজার কড়া নড়ে উঠল, বিমল তখন উঠেছে। মুখ হাত ধুয়ে সে বিব্রত হয়ে বসে ছিল—ভাবছিল বেড়াতে বেরুবার কথা। পিনাকী এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে; ওই শীর্ণ দেহ—এতেও ওর নাক ডাকছে। সম্ভবত আরামটা হয়েছে বেশী। কিন্তু এই ভোরে কড়া নেড়ে ডাকছে কে?

দরজা খুলতেই দেখলে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য। তার পিছনে অরুণা। হাতে কেটলি, চায়ের কাপ।

—এ কি? এই সকালে চা নিয়ে খাওয়াতে এসেছেন?

লাবণ্য বললে—আপনি খুব সকালে বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যান—সে আমি জানি। তার আগেই আসব বলে এলাম। কিন্তু পিনাকী এখনও ঘুমুচ্ছে? পিনাকী! পিনাকী!

পিনাকী চোখ মেলে চাইলে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে—লাবণ্যদি!

—ওঠ, মুখ ধুয়ে চা খাও। তারপর চল—হাতটা খুলে গরম জলে ধুয়ে ভাল করে বেঁধে দেব।

চারদিকে সিটি বাজতে লাগল। মহানগরী ঘুম ভাঙাবার আহ্বান জানাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই বিমল গল্পটা শেষ করতে বসল।

## নয়

রাত্রি তিনটে বাজল।

পাশের বাড়ীর দোতলাতে একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি আছে। যার শব্দ শীতের রাত্রে দরজা বন্ধ থাকলেও শোনা যায়। বিমল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ

করল। চোখ জ্বালা করছে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। আজ সারাটা দিনই লিখছে। গল্পটা শেষ করতে হবে। বাংলা মাসের সংক্রান্তি আজ। হিরণদের কাগজ লেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমলের অনুরোধে সম্পাদক অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। বিমলের উপর ক্রমশ তাঁর আস্থা বাড়ছে। আগামীকাল পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন। কিন্তু বিমল আজই লেখাটা শেষ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। কালকের দিনটা তার নিষ্ফলা দিন গিয়েছে। লাবণ্য, অরুণার নিমন্ত্রণ, কালীনাথের আকস্মিক আবির্ভাব, গোপেনদার ডাক, পিনাকীর ছুটি খাওয়া এবং রাত্রিটা তাকে নিয়ে কাটানো—এই সব নানা ঘটনার মধ্যে লেখার কাজ তার কিছুতেই হয় নি। লেখা দূরে থাক, গল্পটা নিয়ে সে ভাবতেও পারে নি। আজ সকালে পিনাকীকে বিদায় করে সে লিখতে বসেছে। স্নান করে নি, লিখেই চলেছে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবে সে লেখে। এ লেখার যত যন্ত্রণা তত আনন্দ। আবিষ্ট মস্তিষ্কের অন্তরালে দৈহিক সচেতনতা ক্লান্ত কাতর হয়ে থামতে চায়, কিন্তু থামবার উপায় নাই। চলচ্ছক্তিহীন তৃষ্ণার্ত যেমন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলে দূরবর্তী পদ্মদীঘির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই লেখা লিখেই চলে। মধ্যে মধ্যে কলম রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী আঙুল দুটি টেনে ঝটকে নিতে হয়, মধ্যে মধ্যে চা খায়, বা পাশে থাকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই, একটার পর একটা ধরায়, কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয়। সেই চায়ের জন্যই সে একটা ফ্লাস্ক কিনেছে, নইলে চা খাবার জন্য বার বার উঠে দোকানে যেতে হয়। এর সঙ্গে থাকে একটা পাঁউরুটি আর দু-চার পয়সার মাখন। নিতান্ত ক্লান্ত হলে—এক একবার উঠে রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসে—সেই সময় ফ্লাস্কটা নতুন চায়ে ভর্তি করে আনে।

চুমুক দিয়ে বিমলের চা আর ভাল লাগল না। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন প্রদাহ অনুভব করছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে কুঁজো থেকে গড়িয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃপ্তি পেলে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে হল না। একটু চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শেষরাত্রে স্তব্ধ মহানগরী। রূপকথার জনহীন পুরীর মত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এ অঞ্চলটা মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে এমন কোন কারখানা নাই যা দিনরাত্রি চলে। খবরের কাগজের আপিস থাকলে এতক্ষণে রোটারী চলতে সুরু করত। স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজারের মেসিনরুম এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। বসুমতীরও রোটারী আছে। এ ছাড়া আর সব বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসপাতালে রোগী দু'একজন জেগে আছে। নার্স ঢুলছে। হাঁপানীর রোগীরা উঠে বসে কাশছে, হাঁপাচ্ছে। চোরেরাও আর জেগে নাই; তারা নৈশ অভিযান সেরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহপণ্যাদের পল্লীতেও তাণ্ডবের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজপথের উপর। চিক্ চিক্ শব্দ করে চকিত হয়ে ছুটে পালাল একটা ছুঁচো। তার পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদুর।

*পল্লীগ্রাম হলে হয়তো দেখা যেত সাপ। কিম্বা বাপ্ শব্দ করে লাফ দিয়ে পালাত একটা*

'চাউস বেড়াল'। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত বাদুড়। গাছ থেকে ডাকত পেঁচা। আর ডাকত অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে জনহীন রাজপথ। দু ধারে গ্যাসের বাতি জলছে, মধ্যে মধ্যে দু-একটার শিখা কাঁপছে—লালচে হয়ে উঠেছে তাদের শিখা, ম্যান্টাল ভেঙে গেছে। কালো পিচ দেওয়া পথের রঙ মনে হচ্ছে ইস্পাতের মত। শীতের রাতে ছাইগাদায় শুয়ে আছে পথবিহারী কুকুর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল। তারপর ফিরে এসে আবার লিখতে বসল। মিহিরের বাবাকে নিয়ে গল্প। কিছুদিন আগে সে তাঁকে দেখেছিল, বর্ষার রাতে ভাঙা ফাটলধরা পুরানো ড্রয়িংরুমে পায়চারি করতে। সেই দিনই তিনি বিক্রী করেছিলেন তাঁর বাড়ী। লালচে কেরোসিনের আলো পড়েছিল তাঁর পীত পাণ্ডুর দেহবর্ণের উপর। অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল তাঁর চোখে। অতীতকালের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়। অন্তত: তাই মনে হয়েছিল বিমলের। তাঁর জীবন আজও শেষ হয় নি কিন্তু গল্প তাকে শেষ করতে হবে। তাই সে ভাবছিল। পুরানো বাড়ীখানা ভাঙতে সুরু করেছে এইটুকু সে জানে। মিহিরের বাবা কোথায় তাও জানে না। মিহিরকেও সে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। তাই তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের বাপের কথা। মনে পড়ল তার শেষ জীবনে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহলটি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি আর বাইরে বড় বের হতেন না। দিনে থাকতেন পূজো অর্চনা নিয়ে, শাস্ত্রপাঠও করতেন, গভীর রাত্রে তিনি গিয়ে উঠতেন ছাদে। মনে পড়ছে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে সে শুনতে পেত ছাদের উপর ভারী পায়ের খড়মের শব্দ বাজছে খট-খট, খট-খট। মধ্যে মধ্যে শব্দ বন্ধ হত। সে শুনেছে, তার মা বলতেন—আর তিনি তাকিয়ে থাকতেন উত্তর দিকের দূরের গাছপালার দিকে; রাত্রির অন্ধকারে গাছপালা স্পষ্ট দেখা যেত না কিন্তু তিনি নাকি বলতেন, ওই ডিহি শ্যামপুরের অশথগাছের মাথা, ঐ তারাসায়রের পাড়ের শালবনের শোভা, দেখতে পাচ্ছ?

হাতে কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে বসল।

"শেষ রাত্রির মহানগরী! নিস্তব্ধ, কিন্তু আলোকিত। জনহীন পথঘাট। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন তৈরী বিশাল প্রশস্ত কংক্রিট করা পথের ধারে জলছে ইলেকট্রিক আলোর সারি—সেই পথের ধারেই একটা বিশাল পুরানো ধ্বংসস্তূপ। অর্ধেক ভাঙা হয়েছে—ছাদ নাই, দরজা জানালা ছাড়ানো হয়ে গেছে। একদিকে সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং পুরানো চুন সুরকীর গাদা পড়ে আছে।

তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ; পীত পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে মৃতের দৃষ্টির মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বিশাল পুরানো বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীতকালের যক্ষ, মুক্তি পেয়েও বিব্রত হয়ে পড়েছে; মাথার উপরে গ্রহতারকার দীপ্তময় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ভাবছে কোথায় যাবে? মধ্যে মধ্যে নিজের পাঁজরায় হাত বুলায়, মনে হয় পাঁজরাগুলি ভেঙে গেছে—বুকের মধ্যে জমে উঠেছে অস্থিপঞ্জরের ভগ্নস্তূপ, ঠিক এই চুন সুরকীর ভগ্নস্তূপের মতই। কদর্য লাগে নূতন কালের ইমারতগুলি, গড়িয়ে আসে চোখ থেকে জলের ধারা। রাত্রি শেষ

হয়ে আসে। অকস্মাৎ এক সময় বড় বস্তীর ধারের ইলেকট্রিক আলোগুলি নিভে যায় এক সঙ্গে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটতে থাকে কিন্তু মূর্তিকে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্তি মিলিয়ে গেছে বোধ হয়। সকালে শুধু দেখা যায় ওই ইট চুন সুরকীর স্তূপের উপর পড়ে আছে ছেঁড়া একটা শালের টুকরো; জীর্ণ পুরানো শালের আঁচলার খানিকটা। মজুরের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, ছেলেদের খেলা করতে দেবে।

সকাল বেলা ওদিকে মিহির বের হয় তার কাজে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে সে চলে—ডকের ওখানে তাকে সাড়ে সাতটায় পৌঁছুতেই হবে। সে এখন কাজ নিয়েছে ডকের নূতন কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টে।"

শ্রী পত্রিকার সম্পাদক কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। মোটা নাক, বড় বড় চোখ, বলিষ্ঠা চেহারা, যেমন হাস্যরসিক তেমনি অপ্রিয়ভাষী। এই দুয়ের যেখানে সংমিশ্রণ হয় সেখানে লোকটির জুড়ি মেলা ভার। আর একটি দুর্লভ গুণ মজলিসী শক্তি। সকাল আটটা থেকে চেয়ার জুড়ে বসেন—খাওয়া নাই স্নান নাই ঘর নাই সংসার নাই আছে শুধু কাগজের আপিস আর লেখকের দল, একদল আসে একদল যায়, গল্প লেখক, প্রবন্ধ লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রফেসর, ধনীর সন্তান আর রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত।

চায়ের পেয়ালা খালি বা ভর্তি টেবিলের উপর আছেই। মধ্যে মধ্যে টোস্ট ডিম আসে। কখনও চলে নূতন কালের সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা, কখনও চলে নূতন কালের প্রশস্তি; অর্থাৎ যখন যাদের দল ভারী থাকে তখনই চলে তাদের মতের উচ্চ ঘোষণা।

সম্পাদক বিজয়বাবু কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ মত প্রকাশ করেন না, শুধু হুঁ-হাঁ করে যান মধ্যে মধ্যে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করে হাসির উল্লাসে জমিয়ে তোলেন আসরকে। মধ্যে মধ্যে লোকটির অকপট চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সে কিন্তু কদাচিৎ।

গল্পটি নিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিমল। এঁদের এই আসরে প্রত্যেকেই তার চেয়ে খ্যাতিমান। এবং সকলেই এই গ্রাম্য লোকটির প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা পোষণ করে থাকেন। সে বিমল জানে। কিন্তু তাকে জয় করতেই হবে। জেনে শুনেও সে আসে লেখা নিয়ে, চেষ্টা করে সম্পাদককে একা পেতে। একা তাঁকে শুনিয়ে লেখাটি তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় দলের ভিড় এসে পড়লে চুপ করে একপাশে থাকে। এদের তরল উচ্ছ্বসিত সংস্কৃতি-বিলাস চোখ মেলে চেয়ে দেখে। এবার কথা হচ্ছে—বিমল এই কবি ও গল্প লেখকদের সকলের চেয়েই বয়সে বড়, কিন্তু সে এখানে বসে থাকে সকলের কনিষ্ঠের মত।

শুধু নীরেন তার একমাত্র সমবয়সী এ দিক দিয়ে—অর্থাৎ এই অবজ্ঞাত সহকারী সম্পাদকটিই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। আর সম্পাদক বিজয়বাবু অন্তরঙ্গ না হলেও তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এক ক্ষেত্রে বিমলের কাছে বিজয়বাবুকে ঠকতে হয়েছে।

শ্রী পত্রিকা প্রথম বের হচ্ছে সেই সময়ের কথা। এই আপিসেই বিজয়বাবু প্রত্যেককেই লিখতে অনুরোধ করলেন তাঁর কাগজে, শুধু বিমলকে অনুরোধ করলেন না। কথা দু'চারটে বললেন—অবশ্য—তাও আরও দু'চারটে সিঙাড়া কচুরী নেবার অনুরোধ জানিয়ে। সিঙাড়া

কচুরী বিমল খেলে না কিন্তু উঠেও গেল না আসর থেকে। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকা। গল্প লিখবেন স্থির হল বিখ্যাত গল্পলেখক সূর্য লাহিড়ী এবং কমল রায়। আসরের শেষে উঠে গেল বিমল। সন্ধ্যায় নীরেন তার বাসায় এসে তার কাছে কাতর ভাবেই ক্ষমা চাইলে, সে-ই তাকে এরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওই আসরে। প্রত্যক্ষভাবে বিজয়বাবুর সঙ্গে বিমলের আলাপও সেই প্রথম। বিমল হেসে সেদিন নীরেনকে বলেছিল—দোস, ও সব কথা ছেড়ে দে। কাল রাত্রি থেকে একটা লেখা সুরু করেছি, শুনবি? শেষ হয় নি তবু শোন না খানিকটা—।

লেখা যতদূর হয়েছিল পড়া শেষ হতেই নীরেন তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—লেখাটা শেষ কর। আর আমায় না বলে কোথাও দিবি না বল?

—দেব না?

—ওরে তুই যেন হঠাৎ সোনার কাঠি খুঁজে পেয়েছিস। লিখে ফেল বিমল—লিখে ফেল।

সত্যিই সোনার কাঠি হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। লেখা শেষ করে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লেখাটার শেষের দিকে বিজয়বাবুর প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভটাই হয়তো সে সোনার কাঠি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

নীরেন গল্পটা চেয়ে নিয়ে শুনিয়েছিল বিজয়বাবুকে। বিজয়বাবু লেখাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে এসে বিমলের টিনের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন লেখাটি আমায় দিতে হবে। এই প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব আমি, সূর্যবাবুর লেখা দ্বিতীয় সংখ্যায় যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—শ্রীতে আপনাকে লিখতে হবে, নিয়মিত ভাবে লিখতে হবে। আপিসের আসরে যাবেন।

আসরে সে আসে, চুপ করে একপাশে বসে থাকে, শোনে। বড় বড় কথা, অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহিত্যের কোটেশন। মোটামুটি ওমরখৈয়ামী ধারা—জীবন একপেয়ালা আনন্দ-রস, তার উপর জমে আছে বেদনার ফেনা।

তাকে দেখেই বিজয়বাবু বললেন—আপনার জন্যে বসে আছি। বসুন। ওরে চা নিয়ে আয়। পড়ুন লেখা পড়ুন।

লেখাটি হাতে দিয়ে বিমল বললে—আপনি দেখুন। আমার শক্তি নেই আর। ঘুমে চোখের পাতা ভেঙে পড়ছে। চাও খাব না, কাল থেকে দিনরাত চা খেয়ে আছি।

বিজয়বাবু মজলিসে উপস্থিত লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—থাক এখন।

—আমি উঠি।

না। ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকটা।

একখানা বইয়ে ঠাসা ঘর, বিজয়বাবুর লাইব্রেরী, তারই মধ্যে একটা ক্যাম্পখাটে একটা বিছানা পাতাই আছে। মধ্যে মধ্যে বিজয়বাবু এখানেই রাত্রি কাটিয়ে থাকেন। পত্রিকা বের হবার আগে দুদিন থাকতেই হয়, তা ছাড়াও থাকেন—কবিতা লেখার নেশা চাপলে সেদিন আর বাড়ী যান না। আর দু'চার দিন থাকেন; বইয়ের আলমারীর ফাঁকে প্রকাণ্ড

বিয়ারের বোতল রাখা রয়েছে। আলমারীর পিছনে আরও দু'চারটে ছোট বোতল খুঁজলে পাওয়া যাবে। জটিল চরিত্রের লোক বিজয়বাবু। লেখক দলের এক গোষ্ঠী আছে যাদের নিয়ে এই হৈ হৈ করে বেড়ানোও তাঁর জীবনের একটা দিক।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বিজয়বাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিজয়বাবু ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। বিমলের মুখের ওপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে ষাট ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেকট্রিক বাল্ব, আলোটা জ্বলছে। তীব্র আলো, চোখে লাগল। বিজয়বাবু বললেন—উঠুন। রাত্রি নটা বাজে। নীরেন।

নীরেন উত্তর দিলে—যাই।

পাশে বাথরুমের দিকে দেখিয়ে বিজয়বাবু বললেন—যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিমল দেখলে—নীরেন এসেছে, টেবিলের উপরে তিনটি প্লেটে ডবল ডিমের মামলেট—আর চা।

বিজয়বাবু বললেন—খেয়ে নিন। তারপর গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনব।

বিমল শঙ্কিত হল। পড়তে পড়তে তা হলে কি সে নিজেই বুঝতে পারবে লেখাটা ভাল হয় নি?

বিজয়বাবু তাড়া দিলেন—পড়ুন।

সঙ্কোচ রেখে বিমল খাতাটা টেনে নিলে। ব্যর্থ হয়ে থাকে—তাতেই বা কি? বইতে পারবে সে ব্যর্থতার বোঝা। পড়তে আরম্ভ করল সে।

—মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী।

গল্প শেষ করলে বিমল। বিজয়বাবু বড় বড় চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। চোখে শিরার জাল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে নেশা করেছেন তিনি। নীরেনও চুপ করে বসে রয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজয়বাবু বললেন—দিন লেখা।

নীরেন আবার হেসে বললে—বড় জবর লিখেছিস রে বিমলা।

গভীর স্বরে বিজয়বাবু বললেন—জবর মানে? বাংলা সাহিত্যের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে এটি একটি। যাও দিয়ে এস প্রেসে। কম্পোজিটার বসে আছে। কাল সকালে শেষ হওয়া চাই।

নীরেন চলে যেতেই, বিজয়বাবু বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে।

বিমল তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি সকলের সামনে এমন চুপ করে বসে থাকেন কেন? ওদের সামনে লেখা পড়তে চান না—।

বিমল তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। বিজয়বাবু বিস্মিত হলেন তার দৃষ্টি দেখে। এমন দৃষ্টি যে এই লোকটির চোখে ফুটতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

বিমল বললে—হয়তো আমারই দোষ। ওঁরা ভাবেন দুঃখের বেনা মাথায় করে জীবন এক পেয়ালা আনন্দ। আমি তা ভাবতে পারি না বিজয়বাবু।

চমকে উঠলেন বিজয়বাবু। এতখানি গভীর-গম্ভীর উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিমল বললে—ওই ধারায় যদি আমাকে ভাবতে বলেন, তবে আমি বলব সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বট পাতা মাথায় দিয়ে আনন্দের ধ্যান করব আমি।

বিজয়বাবু আবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলের দিকে। এ যেন নূতন করে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মধ্যে।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে একদল লোকের জুতোর শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের হাসি। বিমল প্রশ্ন করলে—এত রাত্রে কারা?

বিজয়বাবু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বিরজাদের দল আসছে। বিরজা বিখ্যাত গল্প লেখক, নকুল তার ভক্ত কবি, রতন—বাংলা সাহিত্যের নবীনতম লেখক—বিজয়বাবু ওকে বলেন ডার্ক হর্স, ভূপেন এবং আরও কয়েকজন। রুখা বাবরী চুল আঙুলে জড়িয়ে পাক দিতে দিতে ভূপেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। চমৎকার আবৃত্তি করে ভূপেন, পড়াশুনাও তেমনি প্রচুর। আরও একটি গুণ আছে ভূপেনের। জীবন তার খোলা খাতা। সে ভালবাসে এক অভিনেত্রীকে। স্ত্রী পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করে সে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ভূমিকা রচনা করছে। মধ্যে মধ্যে দশ দিন বারো দিন একাদিক্রমে সেখানেই থাকে, সকলকেই ঠিকানা দিয়ে রেখেছে—'দরকার হলে বাড়ীতে না পেলে সেখানে পাবে আমাকে।' অসঙ্কোচে বলে সে। এর জন্য বিমল ভূপেনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওই ভূপেনই যখন এসে বলে, 'কিছু টাকা আমায় আজ দিতেই হবে বিজয়বাবু। বাড়ীতে বউ বিয়ের বেনারসী পরে রান্না করছে অর্থাৎ কাপড় না কিনলেই নয়। টাকাটা অবশ্য এ্যাডভান্স।' তখন বিমল ক্ষুব্ধ হয়।

বিমল উঠল, বিজয়বাবুকে বললে—চললাম আমি তা হলে।

এককালে ভারতবর্ষে সাহিত্য রচনার কেন্দ্র ছিল বনভূমি। দেবতার স্তবগান রচনা করতেন ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজার সভায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিরা। রাজার স্তবগান মিশিয়েছিলেন তাঁরা দেবতার স্তবের সঙ্গে। মুসলমান আমলে হিন্দু কবিরা গ্রামে পাতার কুটীরে বসে গান রচনা করে গানের দল নিয়ে বেড়াতেন। একালে মহানগরীতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে, প্রকাশকেরা দোকান খুলেছে, কবি লেখক-দের রচনা বই হয়ে বেরুচ্ছে—বিক্রী হচ্ছে সর্বসাধারণের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের কথা এসেছে। মুক্ত হয়েছে রাজার স্তবগান করার লজ্জা থেকে। রাজা গুণী হলে গুণীর গুণগানে লজ্জা নাই কিন্তু রাজার গুণগান আশ্রয়ের জন্য—অন্নের জন্য—সে যে দাসত্ব, চাটু-কারবৃত্তি। চাই জীবনের জয়গান। যে জীবন মাটির তলায় বীজ ফাটিয়ে উদ্গত অঙ্কুরের মত আকাশ-লোকে আলোক স্নানে যাত্রা করতে চায় বনস্পতির মত সেই জীবনের জয়গান। মাটির কঠিন আস্তরণকে চৌচির করে ফাটিয়ে ঠেলে পথ করে নেওয়ার কষ্টে প্রাণান্তকর বেদনায় জর্জর অথচ আনন্দের তপস্যায় বিভোর সেই জীবনের গান। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা

বাধা বিঘ্নকে ঠেলে সে উঠতে চাচ্ছে। দিকে দিকে তার অভিব্যক্তি। যত দুর্বার গতি তার, তত বিরাট বাধা তার সম্মুখে, যত কঠিন বাধা তার পথে তত বিপুল জয় তার, সুখ এবং দুঃখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে দিন এবং রাত্রি আলোক এবং অন্ধকারের মত। এই বেদনা এই আনন্দ মর্মে মর্মে অনুভব না করলে কি সে গাইতে পারে এই গান ?

হন হন করে হেঁটেই চলেছিল বিমল। মনের খুশীতে এবং উত্তেজনার ভাবতে ভাবতেই চলেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মনোহর-পুকুর রোড। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে সে থমকে দাঁড়াল। একখানা শ্যামবাজারের ট্রামে জানালার ধারে অরুণা বসে রয়েছে। অরুণার ওপাশে কে ? পিনাকী ? বাঁকড়া চুল, পুরু চশমার একখানা কাচ দেখা যাচ্ছে। পিনাকীই তো !

চৌরঙ্গী পার হয়ে বিমল এসপ্ল্যানেড এল। অরুণা এবং পিনাকীই বটে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হেসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে নমস্কার করলে। বললে—ওঁকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম চাকরির জন্যে।

অরুণা বললে—একটা অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

গম্ভীরভাবে বললে কথাটা, রাজ্যের ভাবনার ছায়া নেমেছে অরুণার মুখে। গম্ভীর মুখে সে ময়দানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললে—আমি অনেক ভাবলাম, ওখানে ওই ভাবে দর্জির কাজ—। কথাটা শেষ না করে সে ঘাড় নাড়লে বারবার।—পারবে না, সে তা পারবে না।

পথে ভবানীপুর চক্রবেড়ের ধারে বিমল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। এইখানে একটা পাইস হোটেল আছে, সেখানে খেয়ে বাসায় ফিরবে। অরুণা কোন কথা বলল না, সে ভাবছে। পিনাকী একটু হাসলে।

খেয়ে বাসায় ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। কে বসে রয়েছে দরজায় ?

—কে ?

—আমি, পিনাকী।

—পিনাকী ?

—হ্যাঁ। আজও একটু শোব এখানে। ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি পকেটে একদম পয়সা নেই। একখানা দু টাকার নোট যেন ছিল। কিন্তু—

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বিমল অনুভব করলে সে অপ্রতিভের মত হাসছে।

—লাবণ্যদির কাছে গেলে দিতেন কিন্তু বড্ড বকতেন। আমারও লজ্জা লাগল।

বিমল হেসে বললে—ওঠ, দরজা খুলি।

পিনাকীর মাথাটা বোধ হয় খারাপ।

সমস্ত রাত্রিটাই প্রায় বকেছে। আপন মনে নয়, নিজে বকেছে এবং বিমলকে শুনিয়েছে। বিমল শুনবে না আর নিজে সে বকে যাবে—তা হবে না। বিমল যতবার চেষ্টা করেছে ততবার সে ডেকেছে, ঘুমুলেন না কি?

সাড়া না দিলেও সে ক্ষান্ত হয় নাই—আবার ডেকেছে—বিমলবাবু!

তাতেও সাড়া না দিলে—উঠে আলো জেলে গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছে—বিমলবাবু!

একবার বিরক্তি প্রকাশ করে বিমল বলেছিল—পিনাকী এবার তুমি আমাকে সত্যই বিরক্ত করে তুলেছ।

—তা হলে আমি বাইরে গিয়ে বসি, সিঁড়িটায় বসে চুরুট খাই?

—এই শীতের রাত্রে? তুমি পাগল না কি? শুয়ে পড়।

—আমার ঘুম আসছে না বিমলবাবু। অপ্রতিভের মত সে হাসলে।

—কি? তোমার হল কি।

কি যে হয়েছে—এই কথাটা এখনও পর্যন্ত বলতে না পিনাকী এবং ঠিক বুঝতেও পারে নি বিমল। কথা আরম্ভ করেছিল সে অরুণার চাকরি প্রসঙ্গ নিয়ে। তার বুদ্ধি, তার দৃঢ়তা, তার সাহস সম্পর্কে শত-উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা করেই এসেছে এতক্ষণ। অনাথ আশ্রমে প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্যে সে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে—আশ্রমের অধ্যক্ষ নাকি বলেছেন—আপনি—আমাদের তো কুমারী হলে চলবে না, বিবাহিতা হওয়া চাই, শুধু বিবাহিতা নয়, সধবা হতে হবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অধ্যক্ষের মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বলেছে—কেন বলুন তো?

—এই নিয়ম করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।

এর উত্তরে অরুণা এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা করেছে অধ্যক্ষটির মুখের উপর—সে শুনে পিনাকী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে উত্তেজনায় বিছানার উপরে উঠে বসে শতমুখ হয়ে বলে—অদ্ভুত মেয়ে, বিমলবাবু—অদ্ভুত মেয়ে। বললে কি জানেন? বললে—সার্কাসে বাঘ সিংহের আফিং খাওয়ার শুনেছি, আপনারা শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীদের কি খাওয়ান? কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। অরুণা আবার হেসে বললে—সার্কাসে অবশ্য চাবুকও মারে আফিংয়ের সঙ্গে। এখানে হয়তো চাবুকই চালান আপনারা। কারণ শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীরা কখনই বাঘের জাত নয়, গরু-গাধার জাত। বলেই বেরিয়ে এল। সমস্ত রাস্তাটা আমি অরুণার সেই বেরিয়ে আসবার সময়ের মূর্তি ভেবেছি। বুঝলেন—ভেবেছি ঠিক নয় ধ্যান করেছি। কল্পনা করেছি—কালো বিদ্যুতের রূপ। কালো বিদ্যুৎ মনে ভাবা যায়···কিন্তু ছবিতে আঁকা যায় না।

বিমল এবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে—আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড় পিনাকী। ঘুম না

আসে তো—অন্ধকারে শুয়ে ভাবো—কি ভাবে কালো বিদ্যুৎকে রূপ দিতে পার। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ডাকলে—ঘুমুলেন নাকি—শেষ পর্যন্ত উঠে আলো জেলে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—বিমলবাবু।

সকালে উঠে বিমল বিস্মিত হয়ে গেল। পিনাকী সত্যই দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে। বিমলকে দেখেই সে বললে—আমি বাসায় যাচ্ছি বিমলবাবু।

—বাসায় যাচ্ছ? কিন্তু সারা রাত্রি তুমি এই বাইরে বসেছিলে নাকি?

অপ্রতিভের মত হেসে বললে—ঘরের মধ্যে মনে হল বড্ড গরম। ঘুম কিছুতেই এল না। বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আরাম পেলাম। খানিকটা ঘুমও হয়েছিল।

উঠে ঘরের মধ্যে কম্বলটা রেখে—নমস্কার করে সে বললে—চললাম। কাল রাত্রে বড্ড বিরক্ত করেছি আপনাকে।

বিমলের মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রে পয়সার অভাবে পিনাকী বাসায় ফিরতে পারে নাই। এতটা রাত্রে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার ওদিকের ট্রাম না পায় এই জন্যে বিমল পয়সা দিয়ে তাকে যেতে বলে নাই। কথাটা মনে পড়তেই সে পিনাকীকে ডেকে বললে—দাঁড়াও। শোন।

পিনাকী বললে—বলুন। ভারী তাড়া রয়েছে আমার।

এক টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বিমল বললে—সারারাত্রি ঘুমোও নি। হেঁটে যেয়ো না। ট্রামে বা বাসে যাও।

নোটটা হাতে নিয়ে সে বিমলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বিমল তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দেবার জন্যই ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু পিনাকী দরজায় এসে ডাকলে, বিমলবাবু।

—কি? আবার ফিরলে যে! এদিকে তাড়াতাড়ি আছে বলছিলে।

অকুণ্ঠিত ভাবেই পিনাকী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে আর চারটে টাকা দেবেন? মানে পাঁচ টাকা ধার চাচ্ছি।

বিমল সন্তুষ্ট হল না। কপাল কুঁচকে উঠল তার। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলে সে।

পিনাকী বললে—খুব দরকার আমার। পেলেই দিয়ে দেব আপনাকে। না পারি বইয়ের কভার ডিজাইন করে দেব আপনার। দেবেন?

বিমল কোন কথা না বলে চার টাকা এনে পিনাকীর হাতে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টাকা দিতে হওয়ায় মন তার বিরূপ হয়ে উঠল পিনাকীর উপর। ছোকরা যাকে বলে কুগ্রহের মত এসে তার জীবনযাত্রার নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে সুরু করেছে। ও যেদিন আসে সে দিন আর সকালে বেড়ানো হয় না। বেলা অনেক হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটা বাজে। তবু ভাল যে আজ তার কোন ভাগিদের কাজ নাই।

প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বেরুবার মুখেই চিত্ত বললে—কাল সন্ধ্যের পর মিহিরবাবু বলে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন দাদা।

—মিহিরবাবু!

—হ্যাঁ। আপনার দরজার গোড়া থেকে ফিরছেন—আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখেই চিনেছি—সেই সেদিনের ভদ্রলোক। কালীকাকা বলেছিল—দর্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ীর ছেলে। আমাকে কিন্তু চিনতে পারে নি ভদ্রলোক। করলা চালছিলাম নিজেই, একেবারে কুলির মত চেহারা হয়েছিল। আমি বললাম—বিমলবাবুকে চান বুঝি? কিন্তু তাঁর তো ফিরতে দেরি হবে। আমাকে বললে আমি বলতে পারি। বলুন কি দরকার?

চিত্তরঞ্জন কথা বলতে সুরু করলে থামতে চায় না। একজন কেউ অনর্গল কানের পাশে নিতান্ত নিরস ভাবে বকে গেলে মানুষ যে কি যন্ত্রণা অনুভব করে—চিত্ত নিজে বুঝতে পারে না, বেচারী কানে কালা। ওকে থামিয়ে না দিলে ও বকেই যাবে। বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে—বুঝতে পেরেছি। আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো!

চিত্ত কথা শোনে মুখের দিকে তাকিয়ে, অর্ধেক শুনে বোঝে—অর্ধেক বোঝে ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গি দেখে। বিমল মাঝখানে অতর্কিত ভাবে কথা বলার জন্যে সে সতর্ক ছিল না তাই কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নাই। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে—কি বলছেন?

বিমল নিজেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বললে—আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো?

চিত্ত ঘাড় নাড়লে—অর্থাৎ—না।

—তবে?

—আসবেন না বলে গিয়েছেন।

—আসবেন না?

—না। ভদ্রলোকের বাবা মারা গিয়েছেন কি না। বোধ হয় অশৌচের মধ্যে আসতে অসুবিধা হবে।

—বাবা মারা গিয়েছেন? চমকে উঠল বিমল। বিশাল প্রাচীন কাটলধরা প্রাসাদের মধ্যে একটি শীর্ণ বিবর্ণদেহ মানুষের ছবি ভেসে উঠল তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। রক্তাভ কেরোসিন ল্যাম্পের অপর্যাপ্ত কম্পিত আলোয় আলোকিত প্রশস্ত ধূলিমলিন ঘরের মধ্যে স্কটিকের চোখের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে মন্থর ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার উনবিংশ শতকের সভ্যতা আভিজাত্যের জীর্ণ প্রতিভূদের অন্যতম ব্যক্তি চলে গেছেন।

চিত্ত বললে—হার্টফেল করে মারা গেছেন বোধ হয়। অদ্ভুত মৃত্যু! বুঝেছেন কি না!

—কে বললে তোমাকে?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ওখানেই শুনলাম। বোসেদের বাড়ীটা কিনেছে যারা তাদের কাছ থেকে ওই বাড়ীর পুরনো মেটিরিয়েল

কিনেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ওঁরা আজকাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্টের ব্যবসা করছেন জানেন তো। কাঁকুলের ওই দিকে অনেক জমি কিনে রাস্তা করে প্লটে-প্লটে ভাগ করে বিক্রী করেছেন; দু'চারখানা বাড়ী করেও বিক্রী করছেন; অনেক ব্যাপার আছে। পুরনো মেটিরিয়েলের ইট দরজা জানালা লাগাবেন সেই সব কাজে; ভাঙা ইট চুন-সুরকী দিয়ে রাস্তা ঘাট তৈরী করবেন। বাড়ীটার মেটিরিয়েল কিনবেন তিরিশ হাজারে—তা মাল যা মিলবে তাতে অন্ততঃ পঁয়ষট্টি সত্তর হাজারের মার নাই, বুঝেছেন কি না, আরে বাপ্‌রে—কড়ি বরগা দরজা জানালা—সে কত! আর সে সব কাঠ কি? ফার্স্টক্লাস টীক—এ রকম টীক আজকাল আর জন্মায় না।

বিমল চিত্তর হাত ধরে তাকে সচেতন করে দিয়ে বললে—আঃ চিত্ত, বোস মশায়ের কথা বল। শ্রীচন্দ্রবাবুর ভাগ্য ভাল, কাঠ কেন, বাড়ীর ধুলোর মুঠোও তাঁকে পয়সা দেবে। সে কথা থাক।

চিত্ত বললে—পরশু সকালে লোক দেখে বোস মশায় ওই ভাঙা বাড়ীর ইট কাঠ ধুলোর গাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

চমকে উঠল বিমল।

কালই সে তার গল্পটা শেষ করেছে—লিখেছে—শেষরাত্রির মহানগরী। আলোকিত কিন্তু জনহীন, প্রাণহীন যক্ষপুরীর মত। নতুন প্রশস্ত পথের ধারে বিশাল বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে পীত পাণ্ডুরবর্ণ শীর্ণ দেহ, চোখে স্ফটিক চক্ষুর মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি, শুভ্র কেশ একটি মানুষ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিশাল বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীত কালের যক্ষ যেন।

চিত্ত বলেই চলেছিল—নানা জনে তো নানা গুজব নানা জল্পনা কল্পনা করেছিল, কেউ বলে আত্মহত্যা করেছেন, বলে বাড়ীর কোথাও গুপ্তধন আছে, তারই সন্ধানে এসেছিলেন—অন্ধ মন্দ লোকে ডেকে ডেকে ছিল—খুন করে গিয়েছে। শেষে মর্গে গেল—ডাক্তারেরা রিপোর্ট দিয়েছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বিমল।

চিত্ত বললে—শ্রীচন্দ্রবাবুরা এখন ভারী বিপদে পড়েছেন। বুঝেছেন কি না। একটু হাসলে চিত্ত।—মানে, কুলিরা কেউ বাড়ী ভাঙতে আসবে না। এর মধ্যে গুজব হয়ে গিয়েছে যে, ওই বুড়োবাবু ভূত হয়ে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ীর ইট কাঠ আগলায়। তার এক কারণও ঘটে গিয়েছে—বুঝেছেন কি না; হয়েছে কি—কাল লরীতে কাঠ বোঝাই করে আনতে গিয়ে একখানা মোটা কড়ি হাত ফসকে একটা কুলির পায়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে। বাস্। আর যায় কোথা! সব একেবারে দে ছুট। এখন শ্রীচন্দ্রবাবুরা মহা মুস্কিলে পড়েছেন, কাজকর্ম সব বন্ধ। ওদিকে পাড়ার সব বওয়াটের দল যে যাচ্ছে তাকেই বলছে—রাত্রে সে কি আওয়াজ রে বাবা, খচ-খচ, খট-খট ঘুরেই বেড়াচ্ছে সারা রাত্রি। তাই এখন শ্রীচন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে ধরেছেন—চিত্ত তোর লরী নিয়ে তুই বাপু কাজ আরম্ভ কর—তাহলে দেখা-দেখি লোক আসবে।

বিমলের ভাল লাগছিল না এসব কথা, তার মনের মধ্যে এখন দুটি বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব

চলছিল। তার গল্পের মধ্যে ওই অভিজাত বংশীয়ের যে শোচনীয় মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কাকতালীয়ের মত অতি নিষ্ঠুর সত্য পরিণতির সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে—তার জন্য মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করছিল, ভাবছিল গল্পটি মিহির এবং ওদের আত্মীয়স্বজনের চোখে পড়লে তারা কি মনে করবে? তারা কখনই বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না যে, কল্পনা এমন আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, তারা ভাববে—তাদের বংশের কুৎসা প্রচারের জন্যই সে এমন করেছে। আবার তার কল্পনা এমনভাবে সত্যের সঙ্গে মিলে যাওয়াতেও সে আশ্চর্য আত্ম-প্রসাদ অনুভব করছে। তার ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তেই সে নীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে কথাটা বলে আসে। জানিয়ে আসে তার দৃষ্টি কেমন ভাবে সত্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে অকস্মাৎ হন হন করে চলতে সুরু করে বললে—আমি চললাম চিত্ত, আমার অনেক কাজ আছে।

চিত্ত ডাকলে, শুনুন শুনুন।

—কি?

—সব কথাই যে বলা হয় নি।

—কি? আর কি কথা?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে যেতে বলেছিলেন আপনাকে। গিয়েছিলেন নাকি আপনি?

—কেন বল তো? কথাটা প্রকাশ করতে চাইলে না বিমল; চিত্ত কতটা জেনেছে সেটাই আগে জানতে চাইলে। চিত্তকে অবিশ্বাস নাই তার কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ সে যদি কথাটা বলে বেড়ায় বিশেষ করে কালীনাথের কাছে তবে ক্ষতি হবে।

চিত্ত বললে—যদি গিয়েছিলেন তো গিয়েছিলেন। না গিয়েছেন তো যাওয়ার দরকার নেই। মিহিরবাবু বলতে বলে গিয়েছিলেন আপনাকে।

—ঠিক শুনেছ তো তুমি?

এবার চিত্ত হেসে উঠল, বললে—কানে খাটো বলে বলছেন?

বিমল হেসে ফেললে, বললে—তা বলছি বৈকি। তুমি রাগ করো না যেন।

চিত্ত বললে—কালাকে কালা বললে কালারা রাগ করে কিন্তু আমি করি না।

—তা হলে তুমি ঠিক কালা নও।

এই রসিকতায় চিত্ত প্রচুর হাসতে সুরু করে দিলে। খানিকটা হেসে একটু সংযত হয়ে বললে—তার মানে আপনি বলছেন আমি কালা নই, কালা সেজে থাকি। মানে আমি কালা বলে লোকে গোপন কথাও তো আমার সামনে ফিস ফিস করে বলে না, চেঁচিয়ে বলে—আমি দিব্যি শুনি।

আবার সে প্রচুর হাসতে সুরু করে দিল। বিমলও খানিকটা না হেসে পারলে না; তারপর বললে—আচ্ছা চললাম।

—শুনুন—শুনুন। তবে মজার কথা বলি শুনুন। কাল ঠিক তাই হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি বেশ শুনতে পাই। মানে বেশী গ্রীষ্ম হলে কি বেশী বর্ষা হলে আমি কানে একদম শুনতে পাই না। কানের পাশে ঢাক বাজালেও না বেশী শীতেও না; কানে যেন ঝাঁপ ধরে

থাকে। কিন্তু না-গরম না-শীত মানে ঠাণ্ডা আরামের দিন হলে বেশ শুনতে পাই, সে একেবারে সহজ মানুষের মত। এই তো এখন এত কথা বললেন—বেশ শুনতে পাচ্ছি।

হেসে বাধা দিয়ে বিমল বললে—এত কথা কিন্তু আমি বলি নি চিত্ত। কথা সব তুমি বলেছ।

চিত্ত আবার হাসতে সুরু করে দিলে। বললে—ওই আমার স্বভাব। কথা বলি না তো বলি না। বলতে আরম্ভ করলে আর থামি না। এখন কালকের কথাটা বলি শুনুন। শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে আর আমি কি করব, চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু কানে এই বসন্তের আমেজ পড়েছে এখন বেশ শুনতে পাই। আমি শুনতে পাচ্ছি না মনে করে শ্রীচন্দ্রবাবু একজন পার্টনারের সঙ্গে কাল অনেক কথা বলে গেলেন। আমি তা দিব্যি শুনেছি। কাঁকুলেতে কলোনী করছেন না? ওখানে এক বিধবার বাড়ী নিয়ে ফৌজদারী করেছেন, এ নিয়ে হাঙ্গামাতে পড়েছেন। পাড়ার ছেলেরা এমন মারপিট করেছে ওদের লোকদের যে, গাঁইতি শাবল ফেলে যে যার দৌড় মেরেছে—তাই বলছিল—আমার সামনেই বলছিল, মনে করেছিল আমি শুনতে পাচ্ছি না। বলছিল—এদিকে ভূত এদিকে ভূতের বাড়ী—পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে।

বিমল বুঝতে পারলে—গোপেনদা ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাজ সুরু করে দিয়েছেন।

চিত্ত আবার হাসতে লাগল—হাসতে হাসতেই বললে—বুঝেছেন—আমি এমন মুখ করে রইলাম যে কার বাবার সাধ্যি বলে আমার কানে কিছু ঢুকছে। অথচ হাসিতে পেট আমার কর্ কর্ করছে কাদাজলের মাগুর মাছের মত। মনে মনে হাসি আর বলি—বাবাধন, পাড়া গাঁ থেকে এসে কোলকাতায় জেঁকে বসে ব্যবসা ফেঁদেছ। এইবার ফাঁদে নিজেই পড়েছ। এ সব বাবা কলকাত্তাই ছেলে, গাঁইয়া নয়। এরা বাবা পীরকে মানে না। মামদোর বাড়া এরা।

বিমল আবার যেতে উদ্যত হল। চিত্ত এবার তাকে না থামিয়ে তার সঙ্গ নিলে। বিব্রত হয়ে বিমল বললে—ডিপোয় যাবে না?

—ডিপো তো আছেই, চলুন আপনার সঙ্গে যাই খানিকটা। কোথায় যাচ্ছেন?

—দাদার দোকানে, চা খেতে।

—দাদার দোকানে? ওই চোরটার দোকানে? যান আপনি, ওখানে আমি যাব না। দাদার সঙ্গে চিত্তর ঝগড়া হয়ে গেছে কয়লার দাম নিয়ে। দাদা প্রতিবারই অভিযোগ করে—কয়লা খারাপ। সেই অজুহাতে অন্তত মণকরা দুটো পয়সাও না কেটে দাম দেয় না।

চিত্ত বলে—চেয়ে নাও দুটো পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু জবরদস্তি কি ভাঁওতা দিয়ে এক আধলা দিতে দেব না।

দাদা বলে—খারাপ জিনিস দিয়ে ভালো জিনিসের দাম নেবে—সে দেব কেন?

এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। সেই ঝগড়ার কারণে বিমল আজ চিত্তর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

দাদার দোকানে চা খেয়ে বেরিয়ে পথে সে নেমেছে এমন সময় একখানা মোটর তার

পাশ দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই ব্রেক কষে সশব্দে থেমে গেল। গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বের করে শ্রীচন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন—বিমল, বিমল।

বিমলকে এগিয়ে যেতে হল। গাড়ীর মধ্যে শ্রীচন্দ্রবাবু একা নন—কালীনাথও রয়েছে। কালীনাথকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—এস, গাড়ীর মধ্যে এস।

—কোথায়?

—আরে এস না। শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাব—চা খাব—গল্প করব খানিকটা। কালীনাথ বললে।

—আমার কাজ আছে কালীকাকা। লেখা দিতে হবে।

শ্রীচন্দ্রবাবু হেসে উঠে বললেন—আরে বাপ্ রে। সাহিত্যিকেরাও কাজের লোক হয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! আমাদের রুটি এইবার মারা গেল দেখছি।

হেসে বিমল বললে—আপনারা রুটি খান না শ্রীচন্দ্রবাবু—লুচি খান। ভাতও খান না—পোলাও খান। সুতরাং ভাগ্যে যদি রুটি কি ভাত জোটে তবুও আপনাদের পাতে আমাদের হাত পৌঁছবে না।

আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন শ্রীচন্দ্রবাবু। বললেন—সাহিত্যিকেরা কথা বলতে পারে বটে।

কালীনাথ আই-বি ইন্‌স্পেক্টর—দেশের লোককে বিশেষ করে যে লোকেরা এগিয়ে হাঁটে তাদের শাসন করে দমিয়ে রাখাটাই তার অভ্যাস, অভ্যাসমত সে সরাসরি বললে—তোমার সঙ্গে তো গোপেন মুখুজ্জের আলাপ আছে। একটা কাজ করে দিতে পার? শ্রীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধাচ্ছেন কেন বলতে পার?

কালীনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিমল বললে—আমি কেমন করে সে কথা বলব বল?

—আরে এই সেদিন তো তুমি তাঁর ওখানে গিয়েছিলে। কীর্তি বোসের ছেলে—মিহির এসেছিল তোমাকে ডাকতে। তুমি জান না? বলেন নি তোমাকে গোপেনবাবু? শ্রীচন্দ্রবাবু আমাদের দেশের লোক, গোপেনবাবু নিশ্চয় সে কথা জানে—বলে নি?

ধীরে ধীরে কালীনাথের ভিতরের পুলিশ-পুঙ্গব বেরিয়ে আসছে। গোপেনদার সম্পর্কে কথা আরম্ভ করেছিল 'জানেন—বলেন' বলে—এইবার 'জানে—বলে' সুরু করেছে।

বিমল বললে—না জানি না আমি কিছু, তিনি এ সম্পর্কে আমায় কিছু বলেন নি।

—তবে কি জন্যে ডেকেছিলেন?

অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল বিমল এবার, বললে—আমার যে তুমি জেরা আরম্ভ করলে? সত্যিই কোন এনকোয়ারী করছ না কি?

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যবসায়ী। তিনি বলে উঠলেন—আরে না—না! তুমি যে একেবারে রেগে গেলে। উঠে এস—রাগ করো না। হাতটা তিনি ধরে ফেললেন বিমলের।

কালীনাথ বললে—সাহিত্যিকেরা ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল। এইজন্যেই ওরা কিছু করতে

পারে না।

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হতে চান না। মিটিয়ে ফেলতে চান। চিন্ত যখনকার কথা শুনে এসেছিল—তখন থেকে ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ একটা অভাবনীয় মোড় ফিরতে চলেছে।

কালই অংশীদারেরা একটা নূতন খবর পেয়েছেন। খবর পেয়েছেন প্রচুর অর্থ নিয়ে কয়েকটি জমি ও বাড়ী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে বিত্তশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য সুরম্য নির্জন বাসপল্লী গড়তে উদ্যত হয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন—তাঁরা কেবল সিনেমা আর্টিস্টদের জন্য আমেরিকার অনুকরণে স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তুলবেন। সেখানে যে সব তারকারা নিজেরা বাড়ী করবেন—তাঁদের জমি বিক্রী করবেন, প্রয়োজন হলে—কণ্ট্রাক্ট নিয়ে নিজেরাই বাড়ী তৈরী করে দেবেন; যাঁরা বাড়ী নিয়ে থাকবেন—তাঁদের আধুনিকতম ফ্যাশনের—সর্বোত্তম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দেবেন। কয়েকটি সিনেমা কোম্পানীকেও তারা স্টুডিয়ো করবার জন্য প্রলুব্ধ করেছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনে রাখছেন। এই সব সংবাদ পেয়ে তারা বুঝতে পেরেছেন মহানগরী হতে চাচ্ছে এবং হবেই। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট—করপোরেশন—তাদের এলাকা গণ্ডীবদ্ধ করলেও সে গণ্ডীর শাসন মানবে না সে। এই সব আলোচনা করে এঁরা স্থির করেছেন—আরও দূরে অর্থাৎ শহরতলীর প্রান্তভাগে সস্তায় অনেক বেশী জমি তাঁরা কিনে ফেলবেন। কাঁকুলিয়ায় যে জমিটা কেনা হয়েছিল সেটাকে উন্নত করে এখন যে দাম তার দাঁড়িয়েছে তাতে বিক্রী করলে যথেষ্ট লাভ হবে। সেই টাকাটা এখন ওদিকে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতে কল্পনাতীত লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁকুলিয়ার অবিক্রীত জমিটা সবই একসঙ্গে বেচে দেবেন। কালই তার কথাবার্তা সুরু হয়ে গেছে। এখন গোপেনবাবু ওখানকার ছেলেদের নিয়ে যে উৎপাত সুরু করেছেন—সেটা একটা বাড়ী নিয়ে হলেও গোটা জমিটার স্বত্ব নিয়ে সন্দিহান করে তুলবে ক্রেতাকে। সেইজন্যেই এটাকে মিটিয়ে ফেলতে চান শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ভোরবেলা উঠেই শ্রীচন্দ্রবাবু গিয়েছিলেন কালীনাথের কাছে। আই-বি ইন্‌স্পেক্টার কালীনাথ গোপেনবাবুদের মত লোকেদের কায়দা করতে জানে—ওদের গুপ্ত তথ্যও অবগত ওরা। অজগরের সামনে যেতে গেলে ওঝা নিয়েই যাওয়া সঙ্গত এবং নিরাপদ। কিন্তু কালীনাথ জানে, সাপের ওঝার মতই জানে, তার মন্ত্রতন্ত্র সব মিছে, সরকারী পরওয়ানার দণ্ডটি না থাকলে গোপেনবাবুর সামনে সে শ্রীচন্দ্রের মতই অসহায়। তাই পথে বিমলকে দেখে ওকেই ডেকে কাজটা উদ্ধার করে নিতে চাচ্ছে। অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবু। যাদবপুরে ওদের একটা কলোনী আছে। পূর্বের শর্তমত সেখানে একটা আড়াই কাঠা প্লট ভদ্রমহিলাকে দিতে রাজী আছেন, শুধু তাই নয় এখানকার জমির দামের সঙ্গে—ওখানকার জমির দামের তফাৎ হিসাবে ওই জমির উপর সিমেণ্টের মেঝে টিনের দেওয়াল টিনের চাল দিয়ে একখানি দু'কুঠরী ঘরও তৈরী করে দেবেন পনের দিনের মধ্যে। ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ীতে চলে যেতে

হবে। অর্থাৎ এখানকার বাড়ীর দখল ছেড়ে দিতে হবে।

কালীনাথ বললে—তুমি গিয়ে গোপেনবাবুকে বুঝিয়ে বল। বুঝেছ? মামলা-মকদ্দমায় তো ফল হবে না। লেখা যখন কিছু নেই তখন আইনে পাবেন না। ওর ওই ছেলের পাল ক্ষেপিয়ে বিশেষ ফল হবে না। তাতে যদি না শোনে তখন আমি যাব।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—আমার গাড়ীতে যাও তুমি।

কালীনাথ বেরিয়ে এসে যাবার সময় মৃদুস্বরে বললে—আমার নামটায় করিসনে যেন?

নিরীহের মত বিমল বললে—করব না?

—না। বুঝলি না—এটা তো আমার official ব্যাপার নয়।

হেসে বিমল বললে—বুঝেছি।

গোপেনদা অরাজী হবেন কেন এতে? তিনি বললেন—এ তো ভাল কথা! তবে দলিলটা আগে করে দিন। আমার বন্ধু এক উকিলকে বলে দিচ্ছি—সে সব করে নেবে এঁর তরফ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হল। কি বলিস? এদের মত পরিবারের পক্ষে শহরের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় এর চেয়ে অনেকটা আরামে থাকবে।

আবার খানিকটা পরে বললেন—একটু হেসেই বললেন—আর শেষ পর্যন্ত সেই যেতেই হবে।

তারপর আবার গম্ভীর ভাবে বললেন—যে দিক দিয়েই ভাবি না কেন, শহরে আর ওদের থাকার অধিকারও নেই। নাই মানলাম—ধনী দরিদ্রের ভেদ—অক্ষম এবং সক্ষমের ভেদ তো মানতেই হবে। একটা পঙ্গু অসুস্থ ছেলে—আর একটি বিধবা হিস্টিরিক মেয়ে—কি করবে শহরে?

বিমল চুপ করেই বসেছিল। এর মধ্যে নিজের বক্তব্য তার কি থাকতে পারে। সে শুধু ভাবছিল এই মহানগরীর কথা।

গোপেনদা বললেন—তুমি বস একটু, আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কথা বলে আসি। তাঁর মতটা নেওয়ারও তো প্রয়োজন আছে।

বিমল বেরিয়ে এসে খালি বারান্দাটায় একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। কোথায় কেউ বা কারা কিছু কাটছে। শব্দ উঠছে। দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা নতুন বাড়ীর তেতলায় গাঁথনী চলছে, কপিকলে দড়ি ঝুলিয়ে ঝুড়িতে ইট তুলছে টেনে, খন্ খন্ কর্কির শব্দ হচ্ছে। অকস্মাৎ একটা মড়মড় শব্দ উঠল—শব্দ লক্ষ্য করে বিমল দেখতে পেলে একটা নারকেল গাছ পড়ছে—শূন্য পথে ক্রমবর্ধমান বেগে তার ঘন সবুজ পাতায় ভরা মাথাটা মাটির দিকে নেমে আসছে।

দুম্ করে একটা শব্দ হল।

মহানগরী দ্বিপ্রহর ঘোষণা করছে। একটা বাজল।

নির্জন দুপুরের প্রথম রৌদ্রচ্ছটার দিকে তাকিয়ে বিমল দিবাস্বপ্ন দেখছিল। নারকেল

গাছগুলি একের পর এক কাটা পড়ছে। শহরের এই প্রান্তসীমার পল্লীটিকে মানুষ অনেক কাল আগে ফলের জন্ত ছায়ার জন্ত ঝড়কে রুখবার জন্ত যে উদ্ভিদপ্রজা পত্তন করেছিল—তাকে শহরের বিস্তৃতির প্রয়োজনে কেটে ফেলছে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লরী বোঝাই হয়ে চলেছে—শহরের আবর্জনা ভাঙা বাড়ীর ধুলো টুকরো ইট একটা লরীতে গেল। লম্বা কোঁকড়ান চুলের মত লোহার পাড়ের ছাঁট—ওগুলোকেও ফেলা হবে ওই আবর্জনা এবং টুকরো ইট ধুলোর মত সুরকীর স্তূপের সঙ্গে। ডোবা খানা খন্দ বন্ধ করে সমান করা হচ্ছে। যেখানে নারকেল গাছগুলি কাটা পড়ছে সেখানে আগে ছিল কোন এক সৌখীন ধনীর শখের বাগান, বাগানের মধ্যে মধ্য-আয়তনের একটি চমৎকার পুকুর ছিল—সেটাও পুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুকুরের কি প্রয়োজন মহানগরীর মধ্যে? অকারণে কেন বিঘে দেড়েক জায়গা অধিকার করে থাকবে? জলের জন্ত এখানে পুকুরের প্রয়োজন নাই। মাটির তলায় তলায় চলে গেছে এখানে জল সরবরাহের পাইপ। ভোর পাঁচটার পরেই কলের মুখে জল এখানে।

বিমল পল্লীর মানুষ, এবং সে পল্লী ভারতবর্ষের পল্লী। তাই ওই গাছগুলির জন্ত সে গভীর বেদনা অনুভব করলে। বাহিরের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তিতে অন্নব্যবস্থার প্রাচুর্যের লোভে, এদেশের মানুষ শহরে আসে—থাকে—অনেকে বাসও করে কিন্তু অন্তরে পল্লীর প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে তারা। যারা নিজেরা বাড়ী করে এখানে—তাদেরও শতকরা আশীজন পল্লীর বাড়ীটিকে রক্ষা করে যায়। কেউ বা যত্ন করে রক্ষা করে—মধ্যে মধ্যে যায়—ঝাড়ামোছা মেরামত করায়। কেউ বা অবহেলার মধ্যেই বাড়ীটাকে রেখে দেয়। দু দশ বছর অন্তর সেখানে গিয়ে দেওয়ালের গা থেকে বট পাকুড়ের গাছ কাটিয়ে তার উপর বালি চুন লাগাবার ব্যবস্থা করে। মনে মনে সংকল্পও করে এবার সুযোগ পেলেই এখানে এসে থাকবে কয়েক মাস; মুক্ত শীতল বায়ু—অবারিত সূর্যস্নেহ—ভূমিলক্ষ্মীর অকৃপণ সতেজ প্রসাদ প্রাণভরে উপভোগ করবে। কিন্তু মহানগরীর কুহকে যে একবার পড়েছে তার পরিত্রাণ নাই। ছেড়ে গেলেও সে তাকে টেনে নিয়ে আসে। এখানে এলে পড়ে যেতে হয় দ্রুততম গতি ধাবমান জীবনপ্রবাহের মধ্যে। তখন সে স্রোত কেটে পাশে তীরে ওঠা আর হয়ে ওঠে না।

বিমলের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তব ছবি লুপ্ত হয়ে গিয়ে মহানগরীর নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। পিচঢালা মসৃণ রাজপথ সরল ও সমান্তরাল রেখায় চলে গিয়েছে—তার দু'ধারে নতুন বাড়ীর সারি, ছোট বড় নানা আকারের নানা রঙের। ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্টের সারি—দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, চৌরাস্তায় অথবা তেরাস্তায় মোড়ে পল্লীটির প্রয়োজনীয় বস্ত্র সরবরাহের দোকান—মুদীর, মনিহারীর দোকান, চায়ের রেস্তোরাঁ, লণ্ড্রী, ছোটখাটো ওষুধের দোকান—তার মালিক সম্ভবতই হবে তরুণ কোন ডাক্তার যে সদ্য সদ্য পাশ করে পসারের চেষ্টা করছে।

বিমলের স্বপ্নভঙ্গ করে হঠাৎ বেজে উঠল কারখানার বাঁশী। অত্যন্ত নিকটে কোথাও বাজছে। কাছেই কোথাও কারখানা আছে। বিমল উঠে দেখতে চেষ্টা করলে—কারখানার লোহার চিমনীর মাথা কোথাও দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। পূর্ব দক্ষিণ কোণে রেল

লাইনের ধার বরাবর ঘন ঘন পল্লবের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সম্ভবত। গাছগুলো ভবিষ্যতে থাকবে না। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে প্রসারিত হয়ে চলেছে মহানগরী। গাছগুলো কাটা পড়ে যাচ্ছে। বস্তী ভেঙে গড়ে উঠছে নব উপনিবেশ। পল্লী অঞ্চল থেকে দলে দলে চলে আসছে নবযুগের দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল। তারা সেখানে বাসা বাঁধছে। তার মধ্যেও কিন্তু থাকবে ওই কারখানাটি। ও থাকবেই। হয়ত ওরই দৌলতে ওখানকার পারিপার্শ্বিক আরও জমজমাট হয়ে উঠবে। বড় বাজারই একটা গড়ে উঠবে।

গোপেনদা বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। তিনি বললেন—তোমার খানিকটা কষ্ট হল।

বিমল হাসলে।—কি করব বল? ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজী হতে চান না। বলেন আমার শ্বশুরের ভিটে।

হাসলেন গোপেনদা। বললেন—শহরের মাটি বীরভোগ্যা না হোক বণিকভোগ্যা। ভাগ্যান্বেষিণী বাস্তববাদিনী আধুনিকা। অথবা কি বলতে পার। গভান্তর গ্রহণই বল আর মনিব বদলানোই বল হাসিমুখে করে যায়। গরীবের ঘর থেকে বেরিয়ে বলে—বাঁচলাম। সে উনি কিছুতেই বুঝবেন না।

বিমল বললে—তা হলে ওঁদের কি বলব?

—বলবে রাজী হয়েছেন। এই প্রস্তাবই পাকা হয়ে রইল। আমার বন্ধু উকীল এরপর সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবেন।

বিমল প্রশ্ন করলে—দেখবেন, কোন গোলমাল হবে না তো?

—না। অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করে এনেছি। শেষ কথাই আদায় করতাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করে দিলেন—আমার শ্বশুরের ভিটে। একবার ক্ষেপে উঠে বললেন—এই মাটিতে আমি চোখের জল ফেলে যাচ্ছি। এই জল আগুন হয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার সংসার যে এখানে বাড়ী করবে।

তারপর বললেন—চল তোমার সঙ্গে আমিও যাই। আজ আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। মিহিরের ওখানে যাব। সে আবার অশৌচের মধ্যে পড়েছে—তার উপর বাপের টাকা নিয়ে লাঠালাঠি লাগবার সম্ভাবনা আছে ভাইয়ে ভাইয়ে। বড় ভাই নিশ্চয় আসবে ভাগ নিতে।

পথে চলতে চলতে বললেন—ওখান থেকে যেতে হবে খিদিরপুরে। মিহির আটকে পড়ে মুশকিল হয়েছে আমার। লেবার নিয়ে কাজ অত্যন্ত কঠিন। অনেক কষ্টে ওদের যে মনটুকু পেলে—একদিনে একটি গাফিলতিতে সব চলে গেল। তা ছাড়া আরও দলগুলো চেষ্টা করছে। করপোরেশন-ইলেকশন এসেছে তো।

বিমলের হাসি পেল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে। ধনিক-ভোগ্যা মহানগরীতে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে করপোরেশন-ইলেকশন; শ্রমিকদের প্রতিনিধি। পরিকল্পনা ভাল। রাবণরাজা স্বর্গপুরী পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করে স্বর্গলোকে গণতন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে চিরকাল। এ কথা বললে গোপেনদা ক্ষুণ্ণ হবেন—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন তার উপর। গোপেনদার স্বপ্ন সম্পর্কে আদর্শ সম্পর্কে তার মনে যতই রহস্যকৌতুক জেগে

উঠুক—গোপেনদার ওই ইলেকশনে সাফল্যের কামনা সে অন্তর দিয়েই করে। গোপেনদার এটা পাওনা। সন্ন্যাসী যারা ঈশ্বর-সন্ধানে ঘর ছাড়ে—কৃচ্ছ্রসাধন করে, তারা ঈশ্বর না পেলে ততটা বঞ্চিত হয় না, যতটা বঞ্চিত হয় শেষ বয়সে একটি আশ্রয়—অন্ততপক্ষে গঙ্গার ধারে একটি গাছতলায় ছোট একটি কুঁড়েতে সিঁদুরমাখানো পাথরের সামনে একটি পাকা আসন —না পেলে।

পথের মাঝখানে গোপেনদা বললেন—চা খাবে?

—চা? এই দুপুরে? না দাদা।

—তবে তুমি চল, আমি এককাপ চা আর টোস্ট খেয়ে নি। মিহিরের ওখানে তো হবিষ্যি।

শ্রীচন্দ্রবাবু খুশীই হলেন। বিমলের লেখা সম্পর্কে গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন—অনেক মারাত্মক রকম ভুল উক্তি করলেন, মধ্যে মধ্যে দু'চারটে রসিকতাও করলেন, যা থেকে খুব খুশী হওয়ার ভাবটা ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কালীনাথও তাতে ফোড়ন দিলে।

শ্রীচন্দ্র বললেন—আমি শুনেছি, বুঝেছ কালীনাথ—মেয়েরা নাকি চিঠি লেখে বিমলকে! ওঃ—সে সব চিঠি কি!

কালীনাথ বললে—তুমি শুনেছ—আমি দেখেছি!

—দেখেছ? বল কি?

—হ্যাঁ গো। জিজ্ঞাসা কর না। সেদিন হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এদিক দিয়ে। পথে হারামজাদা চিত্তর সঙ্গে দেখা। চিত্ত বললে—বিয়ার খাওয়াতে হবে কালীদা। বললাম—পয়সা নেই। চিত্ত বললে—তবে আমি খাওয়াই তুমি খাও। কি করি—রাজী হলাম। কিন্তু ওর ওই ডিপোর কয়লার ধুলোতে যেতে গা ঘিনঘিন করল। চিত্তই নিয়ে গেল বিমলের ওখানে। গিয়ে দেখি একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—চমৎকার দেখতে, দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের দরজার সামনে। কি ব্যাপার; না বিমলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে—ডাকতে এসেছে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে কালীনাথ বললে—কি ব্যাপার বল তো বাবাজী? চায় খাও খেয়ো—কিন্তু যেন টোপ গিলো না বাবা।

বিমলের সমস্ত অন্তরটা ঘিনঘিন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল সে। কানের পাশ দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, গরম হয়ে উঠেছে কান। জিভের ডগায় অনেকগুলো কটু কথা শানের উপর ক্ষুরের মত দ্রুত এবং চঞ্চলভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগল তবুও সে আত্মসম্বরণ করলে।

শ্রীচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তিনি বললেন—তুমি বড় ভাল্‌গার কালীনাথ।

কালীনাথ বললে—আমরা পুলিশ শ্রীচন্দ্র।

বিমল এবার বললে—কিন্তু পুলিশ হয়ে জন্মাওনি কালীকাকা, জন্মেছিলে মানুষ হয়ে।

কালীনাথ হেসে উঠল। বললে—তুই প্রেমে পড়ে গিয়েছিস বিমল। রেগে উঠেছিস তুই।

শ্রীচন্দ্র বললেন—তাই প্রেমেই পড় বিমল। ওদের খাতা থেকে তোমার নামটা কাটা যাক।

কালীনাথ বললে—আজকাল প্রেমে পড়লে নাম কাটা যায় না হে। মেয়েটির নামসুদ্ধ লেখা হয়ে যায় খাতায়। প্রীতিলতা, কল্পনা—চিটাগাং আর্মারী রেইড কেসের মেয়ে-আসামী-দের নাম শোন নি? লেবংয়ে লাটসাহেবকে গুলী করলে যে দল—তাদের মধ্যে উজ্জ্বলার নাম তো তুমি জান হে। পার্বতীপুরে দার্জিলিং মেল যখন সার্চ হয়—তখন তো তুমি গাড়ীতে।

বিমল উঠে পড়ল। বললে—চললাম আমি।

কালীনাথ বললে—বস্ বস্। রাগছিস কেন?

বিমল বললে—এখনও স্নান করি নি—আর বসা চলে?

শ্রীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন—সে কি? আমি জানি—তুমি—।

কথাটা কিন্তু লজ্জায় শেষ করতে পারলেন না। কারণ অস্নাত অভুক্তের যে ছাপটা বিমলের চেহারায় ফুটে উঠেছিল—সেইটাই তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গে স্তব্ধ করে দিলে। সামনের ঘড়িতে বাজছে দুটো। তিনি উঠে এসে বিমলের হাত ধরলেন। বললেন—স্নান কর, খাও! আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

বিমলের অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। কিছুতেই সে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে না। তার মনে হল যে ক্ষুধা এখন যা হোক কিছু গ্রাস করবার জন্ত আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে—সে ক্ষুধাও এই নিমন্ত্রণের আহ্বানে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, তার গলায় এবং জিভে যেন অখাদ্যের নামে বমন আক্ষেপ জেগে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হঠাৎ সে বলে উঠল—উপায় নেই শ্রীচন্দ্রবাবু। আমার নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা আমার জন্ত বসে থাকবেন।

—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে? আমি টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি—বেলা হয়ে গেছে—

বাধা দিয়ে বিমল বললে—না, সে হয় না। তা ছাড়া সেখানে টেলিফোন নেই।

—বেশ তবে চল—তোমাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না—না। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি! কাছেই নিমন্ত্রণ। তা ছাড়া আমাকে স্নান করতে হবে।

—স্নান তুমি এখানেই করে নাও। আমি কাপড় দিতে বলছি।

—না না, শ্রীচন্দ্রদা।

—তা হবে না বিমল। আমি জানি আমার জন্তেই তোমার দেরি হয়ে গেছে। আরও জানি তুমি যেখানে থাক—সেখানে স্নানের জায়গা নেই। একটা টবে—তুমি রাস্তা থেকে জল ধরে নাও। জল আছে কি না জানি না। থাকলেও সে জল একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

কালীনাথ চুপ করে বসে শুনছিল। সে এবারে বললে—ছেড়ে দাও শ্রীচন্দ্র, ওকে ছেড়ে দাও।

শ্রীচন্দ্রবাবু আবার বিমলের হাত ধরলেন। তাঁর এ আন্তরিকতা হয়তো সাময়িক, এবং

এই সাময়িক আন্তরিকতাটুকুর উদ্ভব বিমলের প্রতি প্রীতিবশত নয়; সম্পদশালীদের প্রশংসালোলুপ মানসিকতার উপরেই এর ভিত্তি; তবুও আর প্রত্যাখ্যান করা তার রূঢ়তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠল না। সে মিষ্টি করেই বললে—ঝঞ্ঝাট বাড়ালেন আর কি। আমার কাপড় ছেড়ে—আপনার কাপড় পড়ে যাব, সমস্তক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে—কোথায় কাঁটা কি খোঁচায় লেগে ছিঁড়বে, বিড়ি খেতে হবে সাবধানে—।

কালীনাথ সোফায় শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট মুখে পুরে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে করতে বললে—ভেরী ক্লেভার চ্যাপ।

বিমল তার কথার কোন উত্তর দিলে না।

## এগার

স্নান করে কিন্তু সত্যই খুব আরাম পেলে। সম্পদশালীরা যত সুখ উপভোগ করে এবং এই মহানগরীর স্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবস্থার যত রকম আয়োজন আছে তার মধ্যে এই স্নানাগারের আরামটিই বিমলের কাছে সব চেয়ে কাম্য; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হল না—ওই ব্যবস্থার প্রতি ওর লোভ আছে। অভিজাত শ্রীচন্দ্রবাবুর স্নানাগারে বড় টব, শাওয়ার বাথ, গরম জল ঠাণ্ডা জল; ব্যবস্থা অনেক। তার উপর নূতন তোয়ালে নূতন সুগন্ধ সাবান; সুগন্ধ তেল শাম্পু করার ব্যবস্থা—ত্রুটি কিছুরই নাই। কাপড় দিয়েছিল নতুন একখানি শান্তিপুরে ধুতি। সম্ভবতঃ রসিকতা করে যে কথা বিমল বলেছিল—তার উত্তরে নিখুঁত ধনিকোচিত ব্যবস্থা।

স্নান করে বেরিয়ে আসতেই শ্রীচন্দ্রবাবু—বললেন—নাও চল। কালীনাথকে পৌঁছুতে যাচ্ছি, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব, কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে।

কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তা করার অবকাশ পর্যন্ত নাই। শ্রীচন্দ্রবাবু জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে অগ্রসর হলেন। বিমল বললে,—আপনারা যান। আমি—

কালীনাথ তার হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে—যাবি তো সেখানে। আয়। এত লজ্জা কিসের!

বিমলের মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললে যেন। মধ্যে মধ্যে শুধু ইচ্ছে করতে লাগল, সে চলন্ত মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

কালীনাথ পথ দেখাচ্ছিল—ডাইনে। আবার ডাইনে। আবার ডাইনে। বাস্।

গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে লাবণ্যদের বাড়ীর সামনে। নামল বিমল। মনে মনে ঠিক করলে ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলে সেও ফিরে আসবে বাসায়। হোটেলে আর ভাত নাই, দোকান থেকে পুরী তরকারী আনিয়ে নেবে। কিন্তু গাড়ী নড়ছে না। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কালীনাথ বললে—ডাক না—শ্রীচন্দ্র না দেখে নড়বে না।

মাথাটা ঘুরে উঠল বিমলের। ইচ্ছে হল একখানা আধলা ইট নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের।

মোটরের স্টার্ট বন্ধ করে বসে ক্লেদাক্ত হাসি হাসছে।

লাবণ্যদের দরজা আপনি খুলে গেল। বেরিয়ে এল পিনাকী এবং অরুণা। তাদের পিছনে লাবণ্য। অবাক হয়ে গেল বিমল। পিনাকী আজ সাজসজ্জা করেছে, তার দেহের প্রতি অযত্ন এবং অপরিচ্ছন্নতার অন্তরালে যে তারুণ্য চাপা পড়েছিল—সে তারুণ্য আজ ফুটে বেরিয়েছে—বর্ষণ-পরিচ্ছন্ন গাঢ় নীল আকাশের ক্ষীণজ্যোতি নীলাভ তারাটির মত। সে আজ চুল ছেঁটেছে—দাড়ি কামিয়েছে, বোধ হয় সাবান মেখে স্নান করেছে—তার উপর স্নোর চিহ্ন সুস্পষ্ট—গায়ে পাটভাঙা লংক্লথের চুড়িদার, পরনে ধোয়া ধুতি, পায়ে সাদা রঙের ফিতে দেওয়া স্যাণ্ডেল। একটি মিষ্টি গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অরুণার পোশাকে আতিশয্য নাই—কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল—শুধু চুলে আজ তেল না দিয়ে হয় সাবান দিয়েছে নতুবা শাম্পু করেছে, রেশমের মত নরম কালো চুলের রাশি ফেঁপে পড়ে আছে পিঠের ওপর; এতে তার রূপ যেন বেড়ে গেছে। ওকে আর কালো মেয়ে বলে উপেক্ষা করা চলে না।

পিনাকী একটু হাসল। অপ্রতিভের হাসি নয়। সপ্রতিভ—মিষ্টি অথচ দীপ্ত হাসি হেসে বললে—বসন্ত এসেছে বিমলদা।

অরুণা লজ্জিত হল একটু। সে বললে—জু-য়ে যাচ্ছি আমরা।

পিনাকী বললে—সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় যাব। তবে সবই আপনার দৌলতে। সকাল বেলায় পাঁচটা টাকা না পেলে যে কি করতাম আমি—হঠাৎ সে বলে উঠল—হয়তো আত্মহত্যা করতাম কারুর মোটরের তলায় পড়ে। হাসতে হাসতে পিনাকী চলে গেল, অরুণা তার অনুগমন করলে। লাবণ্য সবিস্ময়ে দেখছিল বিমলকে এবং গাড়ীর আরোহীদের।

কালীনাথ নমস্কার করে বললে—ওকে আমরাই আটকে রেখেছিলাম। ওর কোন দোষ নেই, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের খাওয়াদাওয়ার অনেক দেরি করে দিলাম।

বিমল এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে—অত্যন্ত অপরাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে। বাড়ীর মধ্যে চলুন—সব বলব।

শ্রীচন্দ্র বললে—চলি বিমল। ভালমন্দ খেতে খেতে আমাদের স্মরণ করো ভাই।

বিমল তখন দরজার মুখে, লাবণ্য ঘরে ঢুকেছে—সে ওদের কথা শুনে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এখনও খান নি?

বিমল বললে—বলছি। ঘরের মধ্যে একটা পা দিয়েও সে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, শ্রীচন্দ্রের গাড়ীখানা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে অনেক কথা। অন্য সময় বলব। এখন আমি যাই।

লাবণ্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মৃদু হেসে বললে—বসুন। অনেক কথার একটা কথা বুঝতে পেরেছি। ওঁরা যা বললেন, তাতে মনে হয় আপনি ওঁদের বলেছেন, আপনি এখানে খাবেন। কি ব্যাপার বলুন তো?

বিমল বুঝতে পারলে না কি বলবে।

লাবণ্য বললে, বলুন না কি ব্যাপার? ভদ্রলোক দুটির একজনকে তো সেদিন আপনার ওখানে দেখেছিলাম। অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল আমার।

—উনি আমার গ্রামের লোক, একজন আই-বি ইন্‌স্পেক্টর।

—আই-বি ইন্‌স্পেক্টর?

—হ্যাঁ, আর একজন এই পাড়ারই ধনী ব্যক্তি। উনিও আমার দেশের লোক।

—ওঁদের কাছে আপনি বলেছেন, এখানে খাবেন? হঠাৎ লাবণ্যের কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল। সে বললে, এটা কি হোটেল বিমলবাবু?

বিমল তার মুখের দিকে তাকালে, অভুক্ত অবস্থায় এই ধরণের তীক্ষ্ণ বাক্যের আঘাতে তার মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল। মাথার মধ্যে রক্তের ধারা ঠেলে উঠছে। তবু সে নিজেকে সংযত করলে।

লাবণ্য বললে, দেখুন আপনি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছেন। আপনি বুঝতে পারবেন না কত বড় বিপদ; কিছুক্ষণ আগে পিনাকী আর অরুণাকে নিয়ে ব্যাঙ্কের গিন্নীর বউয়ের সঙ্গে একদফা হয়ে গেছে। কুৎসিত ঝগড়া। আবার—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিমল উঠল। বললে—গোড়াতেই আপনার কাছে মার্জনা চেয়েছি। আবার চাচ্ছি। আমি থাকতেও আসি নি খেতেও আসি নি। আপনার এখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে এ কথাও আমি বলি নি। নিতান্তই পাকচক্রে ঘটে গেছে, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত অন্ন গলাধঃকরণ করার তিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেছিলাম আমার নিমন্ত্রণ আছে। কালীনাথ—ওই আই-বি অফিসারটি—ধরে নিলে নিমন্ত্রণ আমার এখানে। সে-ই বললে, এখানে নিমন্ত্রণ বুঝি? আমি ভাবছিলাম কার বাড়ীর নাম করব। কালীনাথের কথায় তাড়াতাড়ির মধ্যে সায় দিয়ে ফেললাম। ওরা ছাড়লে না, গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে গেল। নইলে এখানে আসতামও না। এসেছি, ওরা গেলেই চলে যাব বলেই এসেছি। এটুকুও অপরাধ হয়েছে এটা স্বীকার করছি।

লাবণ্য বললে—কিন্তু তাতে তো আমার ক্ষতিপূরণ হবে না বিমলবাবু।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ, ক্ষতি। ওঁদের হাসি ওঁদের কথার মধ্যে ওঁদের মনের ধারণা তো প্রকাশ হতে বাকী নেই। আমি অভিভাবকহীনা বিধবা—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবই বা কেন আর ওঁরা এই ধরণের হাসি হাসবেনই বা কেন? এমন বিশ্বাস ওঁদের জন্মাল কেন?

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, তাতে আমার কোন অপরাধই নেই।

—তবে কি অপরাধ আমার? আমি ওঁদের বলে এসেছি?

—আপনারও নয়। বিমল হাসলে। তারপর বললে—দোষ মানুষের মনের। বিশেষ করে শহরের লোকের মনের, বিশেষ করে আই-বি কর্মচারী কালীনাথের মনের দৃষ্টির। যেদিন ও এসেছিল সেদিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল আপনার এখানে। আপনি আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন যখন তখন ও দেখেছিল। সেই ভিত্তির উপর পুলিশের লোক কলকের মনুমেণ্ট বানিয়ে তুলেছে। যাক, কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি চলি। নমস্কার।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লাবণ্যও এল পিছনে পিছনে। ঘরের দরজাটাই সে বন্ধ

করছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটি নারীকণ্ঠধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কথাগুলি বিমলের কানে এসে পৌঁছল। কথাগুলি শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার চলবার শক্তিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

—তারপর লাবণ্যদি, ওই পিনাকী ছেলেটি না হয় অরুণাকে বিয়ে করতে চায়—সেই জন্যই একঘরে বসে হা-হা করে হাসছিল। কিন্তু এই ভদ্দরলোকটি? এর সঙ্গে যে এই ভর দুপুরে মান-অভিমানের পালা গাইলে—এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি শুনি!

লাবণ্য স্তম্ভিত বিমলের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি চলে যান। দাঁড়িয়ে এসব শুনবেন না। বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বিমল পা বাড়ালে। যেতে যেতেই শুনলে—লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—এসব কুৎসিত কথার উত্তর আমি দেব না। তুমি যা খুশী তাই মনে করতে পার।

বিমলের যাওয়ার কথা দাদার দোকানে, কিছু খেতে হবে। কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে সে উঠল—নিজের ঘরে। দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে—আগন্তুকদের জন্য রাখা পুরানো ভাঙা সোফায় বসে পড়ল। মানুষের কদর্যতায় মন তার বিষিয়ে উঠেছে। একটা বিড়ি ধরালে। মনে পড়ল তার পল্লীগ্রামের কথা। পল্লীগ্রামে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কুৎসিত মন নেই এমন নয়, আছে, যেখানে আছে সেখানে হয়তো এই মহানগরীর অধিবাসীদের চেয়ে বেশীই আছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভুল করে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে অথবা অঙ্ক কষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। জীবজন্তুর মত আশ্চর্য একটা বোধশক্তি আছে তাদের। তার মনে পড়ল লালবউয়ের কথা। অভিভাবকহীনা, সন্তানহীনা রূপসী গ্রাম্য ব্রাহ্মণবধূ। তার ভাই ছিল রমজান মের্দা। পাতানো ভাই। রমজান ছিল ভাল ঘরামী এবং পাকা বাসন-চোর। শোনা যায়, এক বর্ষার রাত্রে রমজান এসেছিল লালবউয়ের বাড়ী চুরি করতে। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। রমজান উঠানে বাসনগুলি সন্তর্পণে গামছায় বাঁধছে এমন সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি। পুরুষ নাই বাড়ীতে, রমজান নির্ভয়ে বৃষ্টি ধরবার প্রতীক্ষায় দাওয়ার এককোণে উঠে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট পরেই সে চমকে উঠল—দাওয়ার চালের কোণ থেকে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল তার মাথায়। সে সরে দাঁড়াল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনতে পেলে ঘরের মধ্যে খস-খস শব্দ। তার সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে কান্নার আওয়াজও তার কানে এসে পৌঁছল। কান পেতে শুনে সে বুঝতে পারলে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে, জল থেকে বাঁচবার জন্য বিধবা বউটি বিছানা টেনে সরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করে কাঁদছে। রমজান আকাশের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল, তারপর একসময় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পথে মনে পড়ল গামছার কথা। আবার ফিরল। ফিরে গামছাখানা খুলে নিতে গিয়ে মনে হল—সে ছুঁয়েছে, এ বাসন পড়ে থাকলে কাল সকালে বিধবা বউটি নিজেই মাজবে। ব্রাহ্মণের ঘরের এঁটোকাঁটা ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচারের কড়াকড়ির কথা সে জানত। সে খানিকক্ষণ ভাবলে। ভেবে ঠিক করলে ওর শাস্ত্র ওর ধর্ম ওর কাছে তার নিজের ধর্ম নিজের শাস্ত্রের মতই সত্য। কিন্তু

সেই বা এঁটোবাসন মাজবে কেন? অবশেষে মুক্ত উঠানের উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের নীচে বাসনগুলোকে রেখে সে চলে গেল। দেবে ধুয়ে খোদাতালার দেওয়া বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির তো এই কাজ, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাই তো তার ধর্ম।

পরের দিন সকালে সে দাঁড়াল লালবউয়ের দরজায়। সমস্ত রাত্রি বর্ষণ লালবউয়ের জীর্ণ চাল বিপর্যস্ত করে ঘরের মেটে মেঝেতে ডোবা তৈরী করে দিয়েছে। লালবউ বসেছিল গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

রমজান এসে সেলাম করে বললে—সালাম গো দিদি!

তারপর বললে—আল্লার নাম নিয়ে কই দিদিঠারান—আমারে সন্দ করবেন না। আমার আপন মায়ে আর আপনকাতে সমান দেখি তবু আপনারে দিদিই বলব। প্রথমেই 'বেরাইছে' মু থেকে—আপনি আমার দিদিই।

লালবউ সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

রমজান অকপটে বলে গেল গতরাত্রের কথা। পরিশেষে বললে—দিদিঠারান, আপনি আমারে ভাই বলেন। আমি ঘরখানা আপনার ছাইয়া দি। খড় নাই, তালপাতা কেটে আনি—তাই দিয়া দিই ছাইয়া। দেখবেন রমজানের হাতে তালপাতার ছাউনি খড়ের ছাউনি থেকে ভাল হবে। বলেন আমার দিদি হলেন?

কেউ ছিল না সেখানে; শুধু ছিলেন তিনি যিনি সব সময়ে সর্বত্র থাকেন। তিনি হয়তো অহরহ ঘোষণাও করে থাকেন যা কিছু যেখানে ঘটে সব। কিন্তু শুনতে তো পায় না মানুষ। এ ঘোষণা বুঝতে পারে অনুমান করতে পারে তারাই যাদের আছে ওই বোধশক্তি। পল্লীর মানুষেরা অনুমান করতে পেরেছিল। ওই একটি তরুণী রূপসী ব্রাহ্মণবধূ আর এক মুসলমান তরুণ ঘরামী যে সম্পর্ক পাতালে, যার সাক্ষী কেউ ছিল না তাকে বুঝতে অনুমান করতে। তাদের একদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভুল হয় নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লালবউ আর রমজান ছিল দিদি আর ভাই। নিত্য রমজান দিদিকে নির্জলা-খাঁটি দুধ যুগিয়ে এসেছে। রমজান জেলে গিয়েছে, চুরি করে, রমজানের বউ দুধ যুগিয়ে গেছে ঠাকুরঝির জন্যে। লালবউ ভাইফোঁটার ফোঁটা দিয়েছে রমজানের কপালে, কাপড় দিয়েছে। যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে সে বাড়ীর সন্দেশ মিঠাই লালবউ নিয়ে এসেছে আঁচলে পুরে, রমজানভাইকে দিয়েছে। রমজানের চুরির মালের সম্বন্ধে বারদুয়েক পুলিশ লালবউয়ের বাড়ীও সার্চ করেছে। তবু একটা অপবাদের কথা কেউ কোনদিন মুখে উচ্চারণ করে নি।

মহানগরীর হিসাব অঙ্কের হিসাব। ফরমূলার উত্তর। বাহিরের জগৎ যত বিস্তৃত হয়ে চলেছে, উগ্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, হৃদয় হয়েছে তত সংকীর্ণ, মন হয়েছে তত বুদ্ধিবৃত্তিতীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ এবং অবিশ্বাসী।

হঠাৎ কারও জুতোর শব্দ বেজে উঠল বাঁধানো গলিটার মধ্যে। চকিত হয়ে একটু সোজা হয়ে বসল বিমল। সেই মুহূর্তে বিড়ির খানিকটা আগুন খসে পড়ল কাপড়ের উপর। প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে এবার। সর্বনাশ! কাপড়খানা শ্রীচন্দ্রবাবুর, নতুন পাটভাঙা শান্তিপুরে

কাপড়। পুড়ে গেলে শ্রীচন্দ্রবাবু হয়তো ওই অজুহাতে কাপড়খানা বিমলকে দানই করে ফেলবেন, বলবেন—ওটা অগ্নিসাক্ষী করেই দিয়েছিলাম তোমাকে। হাতে জলন্ত সিগারেট ছিল। অগ্নিদেব তাঁর সাক্ষ্য জলজলে করে ফুটিয়ে রেখেছেন—পাছে মনের কথাটা ভুলে যাই। ও কি আমি ফিরিয়ে নিতে পারি?

বিড়িটা ফেলে দিয়ে সে দড়ির আলনা থেকে টেনে নিলে নিজের কাপড়খানা।

সেই মুহূর্তেই সেলাম করে দাঁড়াল শ্রী পত্রিকার আপিসের দারোয়ান।

—কি খবর?

—চিট্‌ঠি। হিরণবাবু ভেজিল।

হিরণ লিখছে—পত্রপাঠ চলে এসো। জরুরী দরকার। না এলে ক্ষতি হবে।

থাক আজ খাওয়া! চল।

ব্যাপারটা জাঁকজমকের ব্যাপার এবং তাকে নিয়েই।

সমারোহ করে লেখক কয়েকজনকে ডেকে তার ওই গল্পটা পড়া হবে। পড়তে হবে তাকেই। বিজয়বাবু জাঁকিয়ে বসে আছেন এবং রসিকতায় মজলিস সরগরম করে তুলেছেন। বিমল যেতেই তাকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে বললেন—গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনবার জন্যে সব বসে আছে।

বিমল বসল, কিন্তু তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। সে এদের সকলকেই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এদের গল্প পড়ে শোনাতে তার প্রবৃত্তি নাই। কারণ সে জানে এরা প্রত্যেকে তাকে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। হয়তো পড়তে শুরু করে মাঝখানেই তাকে থামতে হবে—অথবা শেষ করে যখন উঠবে তখন দু'একজন ছাড়া কেউ থাকবে না। সে দু'একজনেরও টাকার দরকার থাকবে—এ্যাডভান্স নেবে, সেই জন্য থাকবে।

বিরজা ঢুলছিল। এরই মধ্যে তার আফিংয়ের নেশা জমেছে। রতন রেসগাইড নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

কাব্য-পাগল, দীর্ঘকেশী ভূপেন আঙুলে চুল জড়াতে জড়াতে আপন মনেই ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করে চলেছে। একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, কিছু আঙুর-চোয়ানো সুরা আর প্রিয়া—এই হলেই স্বর্গ।

সদ্য প্রকাশিত কাগজখানা হাতে দিয়ে বিজয়বাবু বললেন—পড়ুন।

বিমল কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে—পড়ার কি দরকার আছে? ছাপার অক্ষরে যখন বের হল—তখন অবসরমত পড়বেন সকলে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। সাহিত্যিকরা কেউ কারও লেখা পড়েন না। পড়ুন, শোনাতে চাই আমি গল্পটা।

রতন রেসের বইটা বন্ধ করে বললে—পড়ুন। তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমাকে একবার চারটের সময় দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্স-এ যেতে হবে।

বিরজা সমানে ঢুলছে, কিন্তু শুনছে সব, সে বললে—আমাকেও একবার যেতে হবে। পড়ুন মশায়।

বিজয়বাবু আবার তাগিদ দিলেন—পড়ুন।

বিমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়তে আরম্ভ করলে। অবজ্ঞার বিনিময়ে অশ্রদ্ধা দেখানোটাই আত্মগুরিতা চরিতার্থ করবার সব চেয়ে সস্তা এবং সহজ উপায়। সাহিত্যিক হিসাবে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা শক্তিমান, তাদের শক্তিকে সে নিজেও স্বীকার করে, সুতরাং অশ্রদ্ধা দেখিয়ে সে নিজেকে নিজের কাছে ছোট করবে কেন? সে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার উপরে ইলেকট্রিক পাখার একটা একটানা শব্দ প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দ হচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছেন; বিরজাবাবু নিজে সিগারেট ধরিয়ে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছেন, যার যখন ইচ্ছে বের করে ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। বিজয়বাবু বললেন—এক মিনিট। বাইরের আপিস ঘরে তিনি উঠে গেলেন।

বিমল এতক্ষণে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। স্তব্ধ হয়ে সকলে সিগারেট টেনেই চলেছেন। রতন আপন মনেই পায়ের ঠেলা দিয়ে চেয়ারে দোল খাচ্ছে, বিরজা বড় বড় চোখ দুটি মেলে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে, ভূপেন চোখ বন্ধ করে এক হাতে ধরে আছে চুলের গুচ্ছ, অন্য হাতে সিগারেটটা পুড়েই চলেছে। আর করেকজন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বিমলের মুখের দিকে।

বিমল দেখলে—সত্য করে প্রত্যক্ষ করলে বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে। সকল তুচ্ছতা সকল ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে প্রতিভার মহিমায় প্রজ্বলিত হয়ে সাহিত্যরসের হবি গ্রহণ করছেন হোমশিখার মত। যজ্ঞকাষ্ঠের অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখার মতই তাঁদের আত্মা যেন বেরিয়ে এসেছে। মহিমান্বিত মূর্তিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালে।

বিজয়বাবু টেলিফোন রেখে ফিরে এসে চেপে বসলেন। বললেন—পড়ুন। বিমল আবার পড়তে শুরু করলে।

পড়া শেষ হল। বিজয়বাবু হাঁকলেন—চা!

ভূপেন বললে, চা নয় মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন একটা রসের কারবারের পর ট্যানিক এ্যাসিডে নেশা ছুটে যাবে। গোটা আষ্টেক টাকা খরচ করুন বিমলবাবু।

—বিমলবাবু না, আমি। আমি পনেরো টাকা দিচ্ছি। চল তোমার সাকীর ওখানে, গান শুনব, কাটলেট খাব। রাজী?

—রাজী।

—বিমলবাবু আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয় যেতে হবে। ভূপেন বললে।

বিমল হেসে বললে—যাব।

রতন অকস্মাৎ বলে উঠল—ভাল হয়েছে গল্পটি। সুন্দর হয়েছে। তারপর উঠে পড়ল সে, বললে—বিজয়দা, কথা আছে।

হেসে বিজয়বাবু বললেন, কোন্ ঘোড়া? বলেই নোটকেস খুলে দু'খানা দশটাকার নোট

বের করে হাতে তুলে দিলেন।

বিমল হিরণের হাত টিপে ইসারা দিয়ে বাইরে এল। বললে, কিছু খেতে হবে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি।

—সে কি ?

—সে অনেক কথা।

পিছনে ভারী পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল কাঠের মেঝেতে। রতন বেরিয়ে আসছে। লম্বাচওড়া কালো জোয়ান রতন—বাংলা সাহিত্যের ডার্ক-হর্স; কালো তেজী ঘোড়ার মতই চলেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও রতন আবার দাঁড়াল। বললে—ভারী ভাল গল্প লিখেছেন বিমলবাবু। বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বিমল একটু হাসল।

হিরণ বললে—আসবেন তো সন্ধ্যেবেলা ?

—দেখি। এখন তো যাব দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্সের ওখানে।

—ওরা আপনার একটা বই ছাপলে, না ?

—হ্যাঁ। ওদের 'জন্মভূমি' কাগজে একখানা বই ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্ছে। সেটাও ওরা ছাপবে।

বিমল বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রতনবাবু ?

—কি ?

—আমিও একখানা বই ওদের দিয়েছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি টার্মে দিলেন ?

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বিমলের মুখের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত কদর্যভাবে মুখ নেড়ে রতন বলে উঠল—আপনাকে বলব কেন ?

বলেই সে দ্রুতপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠে বললে—ঠাট্টা করলাম। কিছু মনে করবেন না। তবে সকলকে তো সমান দেয় না। আপনাকে আমার সমান না দিতে পারে। সুতরাং শুনে কি করবেন ?

হিরণ বললে, চল। তুই যেমন। ঘটোৎকচটা এমনই বটে। ও একটা দুর্বার। শক্তিও যেমন, দম্ভও তেমনি।

অদৃষ্ট মানে না বিমল। কিন্তু এক-একটা দিন এমনই দুঃখ কষ্ট অপমানের বোঝা নিয়ে আসে যে মানতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য বাংলা দেশের লেখকদের পক্ষে নিছক সুখ ও সম্মানের দিন কখনই আসে না। তবুও এক-একটা দিনের দুঃখ কষ্ট অপমানের তুলনা হয় না। এ দিনটাই তেমনি একটা দিন বিমলের পক্ষে।

একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে শ্রী আপিসে ঢুকতেই একটি বুড়ো মুসলমান তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনি বিমলবাবু ? প্রসন্নবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। বহু কষ্টে পাত্তা পাইছি আপনার।

প্রসন্নবাবু একজন নামকরা সাহিত্যিক-কবি। বিমলের এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজয়-বাবুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে সম্প্রতি। এবং বিমলের সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রীতি বর্তমানে ঘনী-

ভূত হওয়ায় তিনি বিমলের উপর বিরূপ হয়েছেন। প্রসন্নবাবুর প্রেস থেকেই বিমলের প্রথম বই ছাপা হয়েছে। মুসলমানটি সেই বইয়ের দপ্তরী, প্রসন্নবাবুরই দপ্তরী। প্রসন্নবাবুই বাংলা দেশের এক বড় প্রকাশককে অনুরোধ করে বইখানির প্রকাশক স্থির করে দিয়েছেন। তাঁরা একশো বই নিয়েছেন। বাকী বইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, তাঁদের গুদামে নূতন লেখকের রাবিশ রাখবার জায়গা নাই। সোনার ধান বোঝাই করে নেয় যে সোনার তরী—তাতে যাচাই করা কষ্টিপাথরে কষা সোনা ভিন্ন অন্য কিছুকে ঠাঁই দেবেন কি করে?

যাক সে কথা। তার জন্যে আক্ষেপ নাই বিমলের। আজ প্রসন্নবাবুর পত্র নিয়ে দপ্তরী তার কাছে এসেছে টাকার জন্য। প্রকাশক আর বই নেন নি, টাকাও দেন নি। প্রসন্নবাবুর কাছে টাকা তার জমা আছে, ছাপার খরচ এবং কাগজের দাম দিয়েও তো কিছু থাকতে পারে, প্রসন্নবাবুর কাগজে সে লিখেছে তার জন্যও সে কিছু প্রত্যাশা করে, কিন্তু সে সব হিসেব-নিকেশ সাপেক্ষ বলে প্রসন্নবাবু দপ্তরীকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দপ্তরী বললে—তিনি চিঠিতেও লিখছেন, মুখেও বলে দিছেন তিনি কিছু জানেন না। এরপর সে একেবারে সোজা বলে দিলে—টাকা না-পালি পর আমি ছেঁড়া কাগজের দরে বেচ্যা দিমু কইলাম আপনারে।

বিমলের মুখ সাদা হয়ে গেল।

দপ্তরী বললে—প্রসন্নবাবুরে কইলাম তিনি কইলেন, আমি তো কথা বলাই দিছি কিছু জানি না, তুমি তার সাথে গিয়া কথা কও, তা বাদে যা খুশী করবারে পার। আমি কইতে যাব না কিছু।

—কত টাকা পাবে তুমি? হিরণ প্রশ্ন করলে।

দপ্তরী পকেট থেকে একটা বিল বার করলে।

—কি হিরণ? সিঁড়ির মাথায় কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়বাবু।

হিরণ তাকালে বিমলের দিকে, স্বতঃ বলবার জন্য অনুমতি চাইলে। বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুলের মত, তার বংশগত শিক্ষাদীক্ষা তাকে বলছে—তুমি বল, দিক তাই বেচে দিক। তুমিও ছেড়ে দাও এই দুঃখ-দৈন্যের তপস্যা। তুমি অক্ষম তুমি অলস তুমি ভীরু তাই তুমি এসেছ সাহিত্যের পথে, ঘরের কোণে বসে রচনা কর কল্পকথা, কলমের ডগায় খোঁচা মেরে মনে কর তুমি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছ অন্যায়কে—মনে কর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছ। ভেবে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর।

বিজয়বাবু নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি?

দপ্তরী উৎসাহিত হল, সম্ভবত সাহিত্যিক সমাজের মাটির জীবনের পরিচয় সে ভাল করেই জানে—জানে একজন অপমানিত হলে এদের অন্য সকলে মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে। সে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করে বললে—কাল সকালে আমি সব বই বেচ্যা দিব মশায়। গুদামে ওই বাজে মাল রাখবার ঠাঁই নাই আমার।

বিজয়বাবুর নাকের ডগাটা স্ফীত হয়ে উঠল। বড় বড় চোখে ফুটে উঠল কঠিন দৃষ্টি; তিনি দপ্তরীর দিকে বার-দুয়েক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে—তার হাত থেকে বিলখানা টেনে নিয়ে

দেখলেন। তারপর নোটকেস তুলে ছ'খানা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—ফেরত দাও চার টাকা। বিল ছাপার টাকার।

দপ্তরী বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে এটা প্রত্যাশা করে নাই। বিজয়বাবু আবার বললেন—থাক টাকাটা, ন'শো বই তুমি আমার বাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবে। শ্যামবাজার। বুঝেছ?

তারপর বিমলের হাত ধরে বললেন—আসুন, আজ থেকে আমি আপনার পাবলিশার হলাম।

বিমল কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু গভীর ভাবাবেগ তার অন্তরের মধ্যে পূর্ণ তিথির সমুদ্রের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। বিজয়বাবু হয়তো নিজেকে আজও আবিষ্কার করতে পারেন নাই কিন্তু সে আজ বিজয়বাবুকে আবিষ্কার করেছে।

চন্দ্রমুখী নামে দেহব্যবসায়িনী কেনাবেচার কদর্যতম হাটের মধ্যে দেবদাসকে ভালবেসেছিল। এমন ভালবেসেছিল যে, ব্যবসা ছেড়ে সে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। সমাজের মধ্যে যাদের স্থান নাই, যুগ-যুগান্তরের ঘৃণার ফুৎকার মানুষেরা যাদের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুৎকারের আকণ্ঠগভীর একটা খণ্ড সমুদ্র তৈরী করে তুলেছে তাদের চারিপাশে—তাদের সঙ্গে পরিচয় মানুষের কম। মানুষ চরিত্রবান বলে নয়, এদের সঙ্গে পরিচয় কেনাবেচার রূঢ় বাস্তবতার মত এমনি শুষ্ক এমনি উপর-উপর যে চন্দ্রমুখীকে বিশ্বাস করতে চায় না মানুষের মন। কিন্তু বিমল আজ চোখে দেখলে—চন্দ্রমুখী আছে। শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলে মনে মনে।

মহানগরীর ডাস্টবিন এই পল্লী। জীবনের কুৎসিত তৃষ্ণা নিবারণের পল্লী। জীবনের যত কদর্যতা উগরে দিয়ে যায় মানুষ এখানে।

বিজয়বাবু বললেন—এ হল অভিনব গয়াক্ষেত্র বিমলবাবু। মানুষের অন্তরের প্রেতলোক এখানে পিণ্ড গ্রহণ করে।

বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করে নাই। কৌতূহলও ছিল। ভূপেনের সাকী শ্রীমতীর ঘরে এসে তাকে দেখে তার কথা-কাহিনী শুনে তার মনে হল আসা তার সার্থক হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীকে সে দেখে গেল। তাঁর সে আবিষ্কারকে সে এতদিন শুধু বিস্ময়কর এবং সুন্দর—এর বেশী বুঝতে পারে নি—তাকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে।

স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা মেয়েটি। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। কথাবার্তা বুদ্ধির বিচারে তেমন মার্জিত হয়তো নয় কিন্তু যত সংযত তত সম্ভ্রমপূর্ণ তত মিষ্ট। শ্রীমতী খ্যাতিসম্পন্না গায়িকা। অভিনয়েও সে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গানের তুলনায় সে কিছু নয়। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুধাক্ষরা। ভূপেনকে সত্যই দেবদাসের মত ভালবেসেছে। তার প্রতি অনুরাগের পরিচয় শ্রীমতীর সর্বাঙ্গে, তারই রুচি অনুযায়ী সে বেশভূষা করেছে; ঘরে-দুয়ারের সর্বত্রও সেই পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা গীতবিতান সাজিয়ে রেখেছে, শরৎচন্দ্রের বই কিনেছে, ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের ছবি টাঙানো, মাসিকপত্র থেকে কেটে বাঁধিয়ে যামিনী রায়,

নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছবি। চীনেমাটির বাসনে সাজিয়ে শ্রীমতী নামিয়ে দিল সিদ্ধ ভেজিটেবল্ কাটলেট ; ভূপেনের হাতে দিলে একটা বাটিতে খানিকটা সুপ। বললে —এটা খাও আগে। ভূপেনের সাহিত্যিক বন্ধুরা আসবে জেনে সে নিজে হাতে পরিচর্যা করে তৈরী করেছে সমস্ত খাবারগুলি।

তারপর আরম্ভ হল গান—বিজয়বাবু বললেন—আপনি বসুন।

ভূপেন গেলাসে মদ ঢালছিল। সে বললে—আপনি কেন? ওকে 'তুমি' বলুন।

—ঠিক হ্যায়। আপসে ঠিক হো যায়গা।

বিরজা টেনে নিলে গেলাস। বললে—তুই বেটা বেশ আছিস। বলে হা হা করে হেসে উঠল।

ভূপেন বললে—তুই অত্যন্ত ভালগার বুঝলি! সে একে একে গ্লাস এগিয়ে দিল। বিজয়বাবু নিজে নিয়ে বিমলকে বললেন—আপনি একটু জিভে ঠেকান। বাস্।

বিমল কপালে ঠেকিয়ে রেখে দিলে।

সকলে তার দিকে তাকালে। বিজয়বাবু বললেন—ঠিক আছে। বিমলবাবুর ওই হয়েছে। ওর ভাগটা হিরণকে দাও। হিরণ না পারে, রেখে দাও—রতন আসবে। নাও—আরম্ভ কর গান।

শ্রীমতী গান আরম্ভ করলে। রবীন্দ্রনাথের গান। ভূপেন তাকে শিখিয়েছে। শ্রীমতী কীর্তন সব চেয়ে ভাল গায়। এমন কীর্তনগায়িকা আধুনিক বাংলাদেশে বিরল। কিন্তু তবু সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই বেশী ভালবাসে। গাইবার আগে সে ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ গানটা গাইব?

ভূপেন সকলের দিকে তাকিয়ে বললে—শুরু হোক রবীন্দ্রনাথে, শেষ হবে চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতিতে। কি বলেন?

—ঠিক হ্যায়। বিজয়বাবু একটা কৃত্রিম কাপ্তেনী উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন।

ভূপেন বললে—আজ সুর বাঁধো আনন্দের তারে। আরম্ভ কর। 'আজ কি বারতা পেল রে'।

হারমোনিয়মে সুর বেজে উঠল, অতি মৃদু স্বরে বাজছে যন্ত্রটা; শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রের সুর লজ্জা পায়। মানায় একমাত্র বাঁশের বাঁশী। সে আরম্ভ করলে গান—

আজ কি বারতা পেল রে কিশলয়!
ওরা কার কথা কয় বনময়!
এসো কবি এসো, মালা পরো, বাঁশী ধরো
হোক গানে গানে বিনিময়।

গানের মধ্যেই ভূপেন উঠে সকলের গলায় পরিয়ে দিল একগাছি করে বেলফুলের মালা। সকলের আগে দিলে বিমলের গলায়।

গানে গানে মনোলোকে সে এক সুরলোক সৃষ্টি করলে শ্রীমতী। সমস্ত দিনের সকল ক্লেদ গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল বিমলের।

মালাগাছি গলায় দুলিয়েই সে বাড়ী ফিরল। অন্ধকারের মধ্যে মনে হল ময়দানের গাছগুলির শাখার প্রান্তে প্রান্তে যেন মুকুলেরা উদ্গত হচ্ছে। গলার মালার গন্ধের সঙ্গেই মিশে আছে সে গন্ধ। মহানগরীকে সে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলে। তাকে বন্দনা করলে।

মহানগরী না থাকলে শ্রীমতীকে কেউ জানত না। নিজেকে নিজেই জানত না হয়তো শ্রীমতী। দূর মুর্শিদাবাদের এক নগণ্য গ্রামে তার জন্ম; প্রাচীন নবাবী আমলের কতকগুলি দেহবিলাসী পেঠেরা এনে তাদের বসিয়েছিল সেখানে, দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে তারা আজও সেই জীবন যাপন করছে। তারই মধ্যে উদ্ভব শ্রীমতীর। অল্পস্বল্প কীর্তন গাইতে শিখেছিল; গুণীজন-সন্ধানী মহানগরী তাকে আহ্বান জানালে—সে এল; মহানগরী তার জীবনের আর কোন বিচার করলে না, বিচার করলে গুণের। সেই বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তাকে দিলে সমাদরের আসন।

চিন্তায় তার ছেদ পড়ল। ট্রাম এসে পড়েছে রাসবিহারী এ্যাভিন্যুয়ে, দেশপ্রিয় পার্ক পার হয়ে চলেছে। ডাবুর হাউসে আজ এত আলো কিসের? আলো গিয়ে পড়েছে পার্কের মধ্যে। একটা গাছে অজস্র সাদা রংয়ের ফুল ধরে আছে। আশ্চর্য, যাবার সময় চোখে পড়ে নি! মন—সবই মন। মন তখন চোখকে দেখতে দেয় নি। এখন মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল।

আজ কি বারতা পেল রে কিশলয়!

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে। গলায় মালাখানি দুলছে।

ওরা কার কথা কয় বনময়!

গুঞ্জন করতে করতে এসে সে দরজা খুললে ঘরের। আলো জ্বাললে। আলোর মধ্যে নজরে পড়ল একখানা খাম পড়ে আছে। দরজার চৌকাঠের কাছে। দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। ডাকের চিঠি নয়। কোন এক বাহক এসেছিল। পত্রখানা তুলে নিয়ে সে খুলে ফেললে। কে লিখেছে? নামের জায়গাটাই আগে দেখলে। 'লাবণ্য'।

লাবণ্য লিখেছে! মনটা রূঢ় আঘাত পেলে। ও-বেলার জের টেনেছে লাবণ্য।

## বারো

দীর্ঘ পত্র। প্রায় পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা। বারকয়েক চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে, দু'চারটে লাইন চোখে পড়ল। চিঠিখানা পড়বে কি পড়বে না ভেবে স্থির করতে পারছিল না বিমল। কয়েক জায়গায় অরুণার নাম রয়েছে। সম্ভবত অরুণাকে এনে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করে থাকবে। এ অভিযোগ করবার অবশ্যই অধিকার আছে লাবণ্যের। আরও কিছুক্ষণ ভেবে সে চিঠিখানা পড়লে। চিঠির আরম্ভে কোন পাঠ নেই। সরাসরি লিখেছে —"ও-বেলায় আপনাকে যে সব কথা বলেছি—এবং যে ব্যবহার করেছি তার জন্য নিজের

কাছেই নিজে লজ্জা পেয়েছি, নিজেকেই অনেক তিরস্কার করেছি, কিন্তু তাতেও যেন অপরাধের ভার লাঘব হচ্ছে না। সেই জন্যই অনেক ভেবে আপনাকে পত্র লিখছি, পত্রযোগে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সব চেয়ে দুঃখ হচ্ছে···বেলা দুটোর পর আপনি অভুক্ত জেনেও আপনাকে ঘর থেকে একরকম বের করে দিয়েছি। মানুষের জীবন এবং চরিত্র নিয়ে আপনার কারবার, আপনি এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, রাগ করে হোক, ঘৃণা করে হোক আপনার জন না খেলে—মেয়েরা সব চেয়ে বেশী দুঃখ পেয়ে থাকে। আমার দুঃখের এবং লজ্জার আর সীমা পরিসীমা নেই। আপনি খান নি এ কথা জেনেও আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি নি, উপরন্তু অপ্রিয় কটু কথা বলেছি। যে সময়ে আপনি এখান থেকে গেছেন তখন বোধ হয় আড়াইটে, তখন কলকাতার কোন হোটেলে ভাত ছিল না। সমস্তটা দিন আপনি নিশ্চয় উপবাসে কাটিয়েছেন। বন্ধু বা আত্মীয় ধনীজন বলে সেখানকার অন্নগ্রহণের অরুচিকর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যদি বলে থাকেন—আমার এখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, তাতে লজ্জা পাওয়া বিরক্ত হওয়া আমার উচিত ছিল না। কিন্তু মনের অবস্থা আমার তখন এমনই ছিল যে এমনই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল স্বাভাবিক ভাবে। আমার কোন হাত ছিল না। আমি তখন নিজের উপর সমস্ত সংযম হারিয়ে বসেছিলাম। এর খানিকটা আভাস আপনি নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। বাড়ীর ভিতর থেকে ব্যাঙ্কার গিন্নীর পুত্রবধূ যা বলেছিলেন—সে আপনি শুনেছেন। 'এই ভদ্রদুপুরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মান অভিমানের পালা গাইলে—এঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি শুনি?' আপনার মনে আছে বোধ হয়। আমার সর্বাঙ্গে কদর্য কাদা মাখিয়ে দেবার যে প্রাণপণ চেষ্টা এই বউটি কদিন ধরে করছে—সে শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

যে দিন থেকে এই বাসায় এসেছি—সেই দিন থেকেই মেয়েটি এই ভাবে আমার পিছনে লেগে আছে। আমার মত অভিভাবকহীনা অল্পবয়সী একটা বিধবা মেয়ে এমনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, এটা তার কাছে শুধু অবিশ্বাসের কথাই নয়—অসহ্যও বটে। মধ্যে মধ্যে সে বলে—যে সব মেয়েরা চাকরি করে, এমনি করে সেলাই-ফোঁড়ের ব্যবসা করে তারা আমার দুচক্ষের বিষ। অথচ আশ্চর্যের কথা এই মেয়েটিই পাশের তিনতলা বাড়ীর শিক্ষিতা বউটির কাছে নিত্য-নিয়মিত ভাবে সেলাইয়ের কাজ শিখে আসে। শুধু তাই নয়, স্বামীর কাছে রাত্রে পড়াশুনা সুরু করেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

হয়তো আমার কিছু দোষ আছে। ওঁদের পারিবারিক মনোমালিন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছি। বউটির শাশুড়ী তাঁর দুঃখের কথা আমার কাছে বলেন, আমি সান্ত্বনা দিয়ে থাকি, তার বিধবা ননদটি আমাদের কাছে আসে—সেলাই শেখে। তার দুটি কুমারী মেয়েও আমার কাছে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে এই বিরোধিতা বেড়েই চলেছে। আমার বহু পরিশ্রমের ফলে আরও তিনজন আমার মতই হতভাগিনী এসে যোগ দিল, ধীরে ধীরে আমাদের কাজের আদর হল, সঙ্গে সঙ্গে বউটিও হয়ে উঠল নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর। তার এই আক্রোশে ঘৃতাহুতি দিলেন আপনি। আরও একটু খুলে বলি। চিত্তদা আপনার দেশের লোক, তাঁকে আপনি ভাল করেই

জানেন। সরল দয়ালু মানুষ কিন্তু নেশা করেন এবং শুনেছি আরও অখ্যাতি আছে। যাই থাক—তিনি আমার কাছে একান্ত আপনার জনের মত। এই মানুষটির একটি অদ্ভুত সহজ দৃষ্টি আছে—যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভালত্ব-মন্দত্ব এক নিমেষে চিনে নেন। তিনি অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে। এই বধূটি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের নামে অপবাদ রটনা সুরু করেন। একদিন চিত্তদা বউটির স্বামীকে রাস্তায় ধরে বলেন—'দেখুন—আপনার বউ যদি এমন কথা আর কোনদিন বলে—তবে আপনার দাঁত ভেঙ্গে দেব। যতবার বলবে ততটি দাঁত আপনার যাবে।' চিত্তদার কথায় এবং কাজে তফাৎ নেই। সে কথা এখানকার সকলেই জানে। ওই তিনতলার মালিক বাবুটি কয়েকদিন আগেই সদর রাস্তার উপর একজন অপরিচিত লোকের হাতে কানমলা খেয়েছিলেন। ঠিক দু'দিন আগেই চিত্তদা তাকে বলেছিলেন, 'শহরে কে কার কড়ি ধারে, এমন মেজাজের জন্যে কার কাছে কোন দিন কানমলা খাবেন আপনি।' পাড়ার কয়েকটি তরুণ প্রহার খেয়েছিল কয়লার ডিপোর কুলীদের কাছে। কাজেই তার শাসন-বাক্যকে উপেক্ষা করতে সাহস করেন নি বউটির স্বামী। স্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন।

হঠাৎ আপনি নিয়ে এলেন অরুণাকে।

চিত্তদা আপনার নাম করে আমার এখানে অরুণাকে নিয়ে এলেন—আমি পরম ভাগ্য বলে মনে করলাম। এতদিন দূর থেকে আপনাকে দেখেছি—আর এবার অরুণার কল্যাণে আপনি কাছে এলেন। প্রথম দিন সেই আনন্দেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে উৎসব করতে চেয়েছিলাম। আপনাদের নামের একটা মোহ আছে। থাক সে কথা। না থাকবেই বা কেন? গোপন করব কেন? সাহিত্যিক শিল্পী দুনিবার আকর্ষণে সাধারণকে টানে। আমাকেও টানে। আমার মনে হয় আপনাদের কাছে গেলেই পাব সকল দুঃখের সান্ত্বনা, সকল অভিমান ক্ষোভে অন্তরজুড়ানো স্নেহস্পর্শ; অনাত্মীয়তার রূঢ়তায় রূঢ় এই সংসারে আত্মীয়তার মাধুর্য সম্ভারে সম্ভারে জমা হয়ে আছে—আপনাদের কাছে; অসম্মানিত সাধারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে আপনাদের সম্মানের অংশ পাব। এই কারণেই তো ওই পিনাকীকে সহ্য করতে পেরেছিলাম। আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তো পরিহাস ছাড়া বিধাতার আর কোন দান নেই; পিনাকী আমাকে ভালবেসেছিল; অকপটে সে ভালবাসার কথা আমাকে পত্রযোগে জানাতেও সে সাহস করেছিল। তার সাহসই বলুন আর ধৃষ্টতাই বলুন—পরিণামে সে বিস্ময়কর। যাক সে কথা।

আপনি কাছে আসাতেই আগুন ধরল। বউটি এবার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ সে আপনার লেখার খুব ভক্ত। তার স্বামী পাড়ার লাইব্রেরী থেকে যে বই নিয়ে আসেন তার মধ্যে আপনার বই-ই বেশী। প্রথম যেদিন আমার এখানে চা খেয়ে গেলেন—সেদিন সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরের দিন থেকে আগ্নেয়গিরির মুখ নতুন করে খুলল। আপনার মনেই বকে যেত—কল্পনা করা কুৎসিত কথা। কান দিই নি। কিন্তু আজ পিনাকী ঘটালে বিস্ময়-কর ঘটনা। বেলা সাড়ে এগারটায় সে এল অভিনব বেশে!—আপনি নিজের চোখেই তার সে অভিনব বেশ দেখেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। চুল ছেঁটে—কামিয়ে প্রসাধন পরিচ্ছন্ন বেশে সে এসে দাঁড়াল—আমার মনে পড়ে গেল রূপকথার বুদ্ধ-ভুতুমের কাহিনী;

রাজপুত্রেরা থাকত বানর আর পেঁচার খোলস পরে। সেই খোলস একদিন পুড়িয়ে দিলে তাদের ভাবী বউয়েরা। রাজপুত্রদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমি হেসে তাকে সেই কথাই বললাম। বিনা ভূমিকায় সে আমায় বললে—ঠিক বলেছেন লাবণ্যদি; বড় ভাল বলেছেন। আমি প্রেমে পড়েছি—তাই আমার সকল ময়লা খোলস খসে গেছে। আমি অরুণাকে ভালবেসেছি। কাল সারারাত্রি আমি ভেবে দেখেছি। তাকে আমি ভালবাসি। অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই লাবণ্যদি। তার চোখমুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেও আমার সাহস হয় নি। বরং ভয় পেলাম আমি। পিনাকী বললে—আমি কোন আপত্তিই শুনব না আপনার। আপনাকে মত দিতেই হবে।

আমি বললাম—আমি তো অরুণার অভিভাবক নই পিনাকী, আমি কি বলব? এ কথার জবাব শুধু অরুণাই দিতে পারে।

বিনা বাক্যব্যয়ে পিনাকী উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম—শুধু একটি কথা বলব আমি পিনাকী, তুমি আমাকে দিদি বল—তাই বলব।

সে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি তুললাম উপার্জনের কথা, আর্থিক সঙ্গতির কথা। বললাম—কোন ভরসায় বিয়ে করবে বলছ—সেটা ভাব। তুমি তাকে ভালবাস, সে-ও যদি তোমাকে ভালবাসে—তবে মনের কথা বলা-কওয়া করে—প্রতীক্ষা কর সুদিনের।

সে বললে—সুদিন তো আসতেও আছে যেতেও আছে লাবণ্যদি। কাল এসে—পরশুও তো চলে যেতে পারে। দুঃখের মুখ তাকিয়ে আজ যদি প্রেমকে উপেক্ষা করি—তবে এর চেয়ে প্রেমের অপমান আর কি হতে পারে? কাল যখন সুদিন আসবে—তখন যদি প্রেমের এ আবেগ না থাকে!

পিনাকী হয়তো পাগল, হিসেবী লোক বিবেচক লোকের কাছে এ-কথাগুলি পাগলামীর কথা ছাড়া কিছুই নয়, উচ্চস্তরের লোকে যা হয় তো বলবেন—প্রেম তো শুধু ভোগের জন্যই নয়, প্রেম যে মানুষকে ত্যাগের পথেও নিয়ে যায়। আরও হয় তো বলবেন—প্রেমের আবেগ যদি সময়ক্ষেপে জুড়িয়েই যায়—তাতেই বা ক্ষতি কি—সেই তো বরং ভাল। আরও হয়তো অনেক কথাই বলবেন—বলতে পারেন; বলুন যাঁর যা খুশী। আমি এর উত্তরে কিছু বলতে পারি নি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, অরুণার সৌভাগ্যে আমার মন ভরে উঠেছিল, চোখে জলও এসেছিল।

তাকে আমি অরুণার কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম—অরুণাকে তুমি বল। তাদের একঘরে রেখে চলে এলাম। শুনে আশ্চর্য হবেন—এর পর অকারণেই আমি কাঁদলাম।

কাঁদছিলাম, হঠাৎ বউটির গলায় শাঁখ বেজে উঠল। আগেকার কালে শাঁখ বাজত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। চীৎকার করে আরম্ভ করলে—কুৎসিত কদর্য অভিযোগ। কদর্যতম অভিযোগ বিমলবাবু, বললে, ব্যবসায়ের একটা আড়াল তৈরী করে—আমরা পেতেছি একটা দেহ-ব্যবসায়ের আসর। আমাকে বললে—। যাক সে কথা। অবশ্য অনেক শুনেছি এমন সব কথা! পথে বেরিয়ে পিছনে বলতে শুনেছি, দুই পাশে বলতে শুনেছি মানুষকে। তাদের

কথাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষ মেশানো কথা কখনও শুনি নি। একে কোনমতে উপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রতিবাদ করবার জন্ত উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে বাঁচালে পিনাকী আর অরুণা। তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—হাসিমুখে মাথা উঁচু করে। অরুণা বউটিকে বললে—কেন এমন ধারা কদর্য কথা-গুলো বলছেন আপনি?

বউটি বললে—কদর্য? তোমাদের ওই কদর্য রসালাপের ভাষ্য কি গীতা-ভাষ্যের মত পবিত্র হবে?

অরুণা বললে—আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ তো আপনিও করে থাকেন। ভালবাসার কথাও বলেন। তাকে কি আপনি কদর্য মনে করেন?

ফুঁসে উঠল মেয়েটি। বললে—কি? আমরা স্বামী-স্ত্রী—নারায়ণ সাক্ষী করে—

বাধা দিয়ে অরুণা বললে—আমরাও স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছি। অবিশ্যি নারায়ণ সাক্ষী রাখবার ভাগ্য হবে না, তবে রেজিস্ট্রী করে আমরা বিয়ে করব।

বউটি দমে গেল—তবু বললে—সে বিয়ে—আর এ বিয়ে—

আবার বাধা দিলে অরুণা। বললে—আইনমতে বিয়ে করছি, এ বিয়েকে গালাগালি দিলে আইনের ফ্যাসাদে পড়বেন আপনি।

মেয়েটিকে চুপ করতে হল এরপর।

আমার মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বললে—ওই বউটিই আমার সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলে লাবণ্যদি। ওকে আমার ঘটকী-বিদেয় দিতে হবে। বলে সে হেসে উঠল।

তারপর ওরা মেতে উঠল সমারোহে। অকস্মাৎ ওদের চোখে ধরা পড়ল—কলকাতায় বসন্ত এসেছে। পার্কে পার্কে ফুল ফুটেছে। খোলা ময়দানে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহ বয়ে চলেছে। পিনাকী বললে—ডালিয়া ফুটেছে অপরূপ হয়ে—চিড়িয়াখানার বাগানে।

বউটির কথাগুলি ফিরিয়ে দিলে সুদে আসলে। হাসতে হাসতে চলে গেল সে বিজয়িনীর মত। কিন্তু আমি? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বউটির বাক্যকণ্টকবিদ্ধ অন্তর নিয়ে। কাঁটা ফুটে বিঁধে থাকলে রক্ত ঝরে না—কিন্তু দুঃসহ বেদনা হয়। আমার অবস্থা হল তেমনি। অরুণার জীবনে সকল কাঁটা গোলাপ হয়ে ফুটল—দক্ষিণা বাতাস তাদের ডাক দিলে—তারা চলে গেল। আমিই অরুণাকে সাজিয়ে দিলাম, অতীত জীবনের স্বামীসৌভাগ্যের অবশেষের মধ্যে কয়েকখানা শাড়ী আছে, তারই মধ্যে সবচেয়ে যেখানা ভাল তাই তাকে পরিয়েও দিলাম। আমার ভাগ্যে কাঁটা ফুল হয়ে ফুটবার নয়, জীবনে সে বিঁধেই রইল, প্রথম জীবন থেকে যত কাঁটা বিঁধে আছে তাতে তার অবস্থা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত; কণ্টকশয্যায় অন্তর আমার শুয়ে পড়েছে আজ।

ঠিক এই সময়ে এলেন আপনি। প্রথমটায় অন্তর আমার পরম আগ্রহে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল—ভীষ্ম যেমন অর্জুনের কাছে চেয়েছিলেন তৃষ্ণা মেটাবার উপযুক্ত ভোগবতীর জল, তেমনি চাইব আপনার কাছে সান্ত্বনার স্নেহ—নির্ঝরের শীতল স্নিগ্ধ-ধারা। কিন্তু কি জানি কেন চাইতে পারলাম না। সঙ্কোচ হল। তার পরিবর্তে আমার মনে

সকল ক্ষোভ বেরিয়ে এল। আঘাত করলাম আপনাকে।"

এর পর অনেকটা অংশ লিখে বার বার দাগ টেনে সযত্নে কেটে দিয়েছে। কৌতূহল হল বিমলের। কি লিখেছিল লাবণ্য? বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল তার। সে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটার খুব কাছে গিয়ে তুলে ধরে চিঠির কাটা অংশটা পড়বার চেষ্টা করলে।

হাত তার কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কিছু ধরা পড়ছে না। কি লিখেছিল লাবণ্য? সে কি লিখেছিল—সে তাকে ভালবাসে?

কিছুই কিন্তু পড়া গেল না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কেটেছে। পাথরের অথবা ধাতুফলকের উপরের লেখা যেমন উখো দিয়ে ঘষে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তেমনিভাবে লেখার উপরে দাগ টেনে টেনে কেটেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিমল।

অনেকক্ষণ পর শেষ অংশটা সে পড়লে।

"দুর্ভাগ্যের এইখানেই শেষ নয়। যে তিনজন সঙ্গিনী এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল —তিনটি বিধবাকে আপনি দেখেছিলেন নিশ্চয়, আশ্চর্যের কথা তারাও বিকেলে আমাকে জানালে তারা আর থাকবে না এখানে, অরুণা এবং আমি যে ভাবে কলঙ্কের ক্ষেত্র করে তুলেছি এই আসরটিকে—তাতে এখানে থাকলে ভবিষ্যতে তাদেরও কলঙ্কের ভাগ নিতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। সুতরাং তারা চলে যাবে। নয়তো—। বুঝেছেন নিশ্চয় নয়তো'র পর কি? আমি ভাবলাম। ভেবে ঠিক করলাম আমিই চলে যাব। আমি চলে যাচ্ছি। হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। দেখা হলেও যে সব অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসবে আপনার জীবনে, আমার জীবনে তাতে হয়তো পরস্পরকে চিনতেই পারব না। হয়তো চিনতে পারলেও—পরিচয়কে স্বীকার করাও সম্ভবপর হবে না। ভাবুন তো যদি কোনদিন পথের ধারে আমাকে ভিক্ষুনীর বেশে ভিক্ষা করতে দেখেন তবে চিনতে পারা সম্ভবপর হবে কি?"

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতখানি তেজ এত বড় অভিমান এত সাহস যে মেয়ের সে মেয়ে না পারে কি? কোথায় গেল সে এই রাত্রে? যতই অসম সাহসিনী হোক লাবণ্য রাত্রির মহানগরীকে সে জানে না। শিউরে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে গেল চিত্তরঞ্জনের দোকানে। রাত্রি অনেক হয়েছে। রাস্তা জনহীন। চিত্তর দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সে বার কয়েক ডাকলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ভাবলে, চিত্ত এখানে নেই, বাসাতে আছে, সেখানে গিয়ে চিত্তকে ডাকবে? অথবা লাবণ্যদের ওখানে গিয়ে লাবণ্যের নাম ধরেই ডাক দিয়ে যারা আছে তাদের কাছে জেনে নেবে লাবণ্যের সংবাদ। তাতে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা আছে, হয়তো বাড়ীশুদ্ধ লোকে কুৎসিত ভাষায় কদর্য অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। এমন কি দুষ্ট লোকের হাতে লাঞ্ছনাও ঘটতে পারে তার।

ঘটুক। যে যা বলে বলুক। সে তাদের সম্মুখীন হবে। সে বলবে—লাবণ্যকে সে

ভালবাসে। তারা পরস্পরের কাছে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। লাবণ্য যদি এখনও না গিয়ে থাকে, তবে তাই না হয় হবে। গ্রহণ করবে সে লাবণ্যকে তার জীবনে। সে আজ যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করছে প্রিয়ার গণ্ডের তিলের বিনিময়ে বোখারা সমরখন্দ দান করার কল্পনা কবির অতিশয়োক্তি নয়, ভাবাবেগে হয়তো বটে কিন্তু এ ভাবাবেগ জীবনে সত্য। বাস্তববুদ্ধিতে এই আবেগের সত্যকে যে লঙ্ঘন করে সে জীবনে হয়তো সমৃদ্ধি লাভ করে, সুনাম হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু আত্মাকে লাঞ্ছিত করে, পীড়িত করে, আত্মা তাকে অভিসম্পাত দেয়—"আজীবন মরুতৃষ্ণায় তুমি তৃষিত হয়ে ফেরো।"

সে দৃঢ়পদেই অগ্রসর হল। খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। লাবণ্যের বাড়ীর ওদিক থেকেই দুজন কারা আসছে। এক মুহূর্ত পরেই সে তাদের চিনতে পারলে। পিনাকী আর অরুণা।

তারা দুজনেও থমকে দাঁড়াল বিমলকে দেখে। বিমল বললে—এ কি? এত রাত্রে কোথায় যাবে?

পিনাকী বললে—আমাদের আজ বাসর বিমলবাবু। বাসর পাততে চললাম। সে হেসে উঠল। তারপর বললে—গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানা—সেখান থেকে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে গেলাম সিনেমায়। ফিরে অরুণাকে পৌঁছে দিতে এসে দেখি দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে শুনলাম ওখানে অরুণার ঠাঁই হবে না। দরজা খুললেন না। বললেন—আছে একখানা কাপড়—সে এসে কাল নিয়ো।

—লাবণ্য? লাবণ্য দেবী বললেন?

অরুণা বললে—লাবণ্যদি নাকি ওখানে নেই শুনলাম। বললেন—সেও এখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন—

—কি বললেন?

পিনাকী বললে—কুৎসিত ভাবেই বললেন অবশ্য—বললেন—অরুণার কপালে চিত্রকর জুটেছে—তার কপালে সাহিত্যিক—বিমলবাবুর ওখানে খোঁজ কর গিয়ে।

অরুণা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—লাবণ্যদি কোথায়?

উত্তর দিলে পিনাকী—বললে—লাবণ্যদিকে আমি জানি অরুণা। বিমলবাবুর ওখানে তিনি যাবেন না। তারপর তার সেই স্বভাবগত অপ্রতিভের মত হাসি হেসে পিনাকী বললে—সে ভাগ্য বিমলবাবুর নয়। লাবণ্যদি চলে গেছেন। চল।

তারা অগ্রসর হল।

বিমল দাঁড়িয়েই রইল। তার প্রশ্ন করতে খেয়ালও হল না—ওরা কোথায় যাচ্ছে? সে ভাবছিল লাবণ্যের কথা। কোথায় গেল লাবণ্য?

মনে পড়ল তার মহানগরীর এক বিশিষ্ট রূপের কথা। এই ধরিত্রী বহুরূপা। আগ্নেয়-গিরির মুখ থেকে যখন অগ্ন্যুদ্গার হয়—তখন তার এক রূপ—সে তখন জ্বালামুখী। অরণ্যের গলিতপত্রের রাশি থেকে উত্থাপিত বাষ্পরাশি ও গাঢ় ছায়ার সংমিশ্রণে তার আর এক রূপ—মন্থর গমনে চলে অজগর, দন্ত নখর বিস্তার করে ফেরে শ্বাপদ; পৃথিবীর সেখানে চামুণ্ডা রূপ।

মরুভূমিতে তার আর এক রূপ। এই মহানগরীতে ধরিত্রীর সকল রূপ প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মানবসমাজের উপরেই হয়েছে—কিন্তু সমাজ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই মহানগরীতে সে প্রতিফলন সব চেয়ে উগ্র—সব চেয়ে স্পষ্ট—সব চেয়ে প্রদীপ্ত।

লাবণ্য অভিমান করে চলে গেল—একবার ভাবলে না মহানগরীর রূঢ় উগ্র রূপের কথা। তার হৃদয়হীনতার কথা। প্রচণ্ড শক্তি না থাকলে এর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। সে শক্তি কি আছে লাবণ্যের?

হঠাৎ এরই মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। অভিমানের আবেগ বেদনার ক্ষোভ যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে—তখন তাকে হার মানানো যায় না, অনায়াসে সে তখন জীবন-মূল্য দিয়েও জয়ের গৌরব অর্জন করতে চায়; সকল ক্ষেত্রে জয়ের গৌরব হয় তো পায় না, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিকে নিশ্চিত-রূপে উপেক্ষা করতে পারে।

কাছেই লেক। কিছুদিন আগেই এই লেকে একটি মেয়ে এবং ছেলে ডুবে মরেছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি মানুষের কাছে পথচিহ্নহীন প্রান্তরে পদচিহ্ন-ধারার মত। লাবণ্যের এই পায়ের ছাপে পা ফেলে চলা বিচিত্র নয়।

হনহন করে সে চলল লেকের দিকে।

জ্যোৎস্নালোকিত লেক। ফাল্গুন মাস—এরই মধ্যে লেকের জলের উপরে ধোঁয়ার মত পাতলা কুয়াসার স্তর জেগে উঠেছে। জনহীন—চারি পাশ খাঁ খাঁ করছে। লেকের ধারের ক্লাবগুলিতেও কোন সাড়া নাই। লেকের মধ্যে দ্বীপগুলির গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না চক্‌চক্ করছে। মধ্যে মধ্যে মাছে সাড়া জাগাচ্ছে লেকের জলে।

ও-কে! দূরে যেন সাদা মূর্তির মত কেউ বসে আছে—একটা বেঞ্চে। এগিয়ে গেল সে।

লাবণ্য নয়। অরুণা এবং পিনাকী। চমকে উঠল তারা। বিমলও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এই লেকের ধারে কেন?

পিনাকী বললে—কি করব? এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব দুজনে।

বিমল বললে—না। চল—আমার ওখানে চল।

পিনাকী রাজী হল না। বললে—বড় ভাল লাগছে। তারপর হেসে বললে—ও বুঝেছি। আপনি সন্দেহ করছেন আমরা মারাত্মক কিছু একটা করে বসব বলে। না-না। সে ভয় করবেন না। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে'—আমরা মরব না।

বিমল অগত্যা ফিরল।

কিন্তু কোথায় গেল লাবণ্য?

সকালে যখন সে উঠল তখন মন তার উদাস হয়ে উঠেছে। লাবণ্যকে খুঁজে দেখবার মত মনের আবেগ নাই কিন্তু সমস্ত কিছুর উপর থেকে তার আসক্তি চলে গেছে।

চিত্ত এসে হাজির হল এই সময়ে। সে বললে—হ্যাঁ শুনেছি সব। আমার সঙ্গে দেখা

করে নি লাবণ্যদি।

তারপর বললে—কে জানে কোথায় গেল। এই শহরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ?

আবার বললে—থাক। কতজন আসছে কতজন যাচ্ছে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। এখন আমি একটা খবর দিতে এসেছিলাম। কাল সন্ধ্যায় দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। আবার আসবেন আজ। কি যেন সব কাজের কথা আছে। আপনাকে তাঁদের চাই-ই।

আজ না হয়ে গতকাল বা আরও কয়েক দিন পরে হলে বিমল মনে মনে মহানগরীকে নমস্কার করে বলত—মহানগরী, তোমার জয় হোক।

## তের

ডাক দিয়েছেন এক ফিল্ম ডিরেক্টর। বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শক্তি'র সর্বাধ্যক্ষ প্রদোষ চৌধুরী একখানা চিরকুটে লিখে দিয়েছেন—"বিমল, আমার বন্ধু বিখ্যাত শিল্পী এবং ফিল্ম ডিরেক্টর হীরু সেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাদের কাগজে তোমার যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে সেটি তাঁর ভাল লেগেছে। ইতি বুনোদা।"

প্রদোষ চৌধুরী বাংলা দেশে বুনো চৌধুরী নামে পরিচিত। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেহারাটাকে চুলে দাড়িতে গোঁফে যথাসম্ভব বন্য করে রাখেন। খ্যাতনামা লোক। দেশের সকল আন্দোলনের মধ্যেই তিনি আছেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই যোগ ঘনিষ্ঠ। মোটামুটি বেশ লোক। বিমল মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলে প্রদোষ চৌধুরীর প্রতি।

হীরু সেন থাকেন টালিগঞ্জে। তারই একজন সহকারী বুনো চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সকালেই এসে বিমলের কাছে উপস্থিত হল। বিমল মনে মনে প্রতীক্ষমাণ হয়েই ছিল। এর পর সে এখান থেকে সরে অন্য কোথাও যেতে চায়; যে কাজ নিয়ে রয়েছে তার চেয়েও অধিকতর আকর্ষণ-বিশিষ্ট কোন কাজ সে চায়। লাবণ্যকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল এবং আকস্মিকভাবে ওই ঘটনার যে পরিণতি ঘটল তাতে জীবন একটা নাড়া খেয়ে গেছে। মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করেছে সে; মধ্যে মধ্যে লজ্জাও অনুভব করছে, দশের কাছে লজ্জা নয়—নিজের কাছে লজ্জা, নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জা, মধ্যে মধ্যে অনুভব করছে যে, সে অত্যন্ত স্বার্থপর। লাবণ্যকে তার ভালই লেগেছিল, তার রূপ ভাল লেগেছিল, তার সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যমকে ভাল লেগেছিল, তার মর্যাদাময়ী সংযত চিত্তকে ভাল লেগেছিল—যার ফলে সে তাকে ভালই বেসেছিল—যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করেছে।

এর জন্য দায়ী এই মহানগরীর সভ্যতা। মহানগরীর সভ্যতার অনাড়ম্বর নীড়ের মধ্যে সুখ নাই শান্তি নাই। আদিম কাল থেকে মানুষ প্রেয়সীর জন্য সংগ্রহ করে এসেছে শাঁখের গহনা—পলা পুঁতির মালা; পল্লীর মধ্যে নববধূর জন্য বর আনে কাচের চুড়ি, রূপার হার, মহানগরীর রাস্তার পাশে পাশে সাজিয়ে রেখেছে মণি মুক্তা সোনার আভরণ, বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণ

বেশভূষা, গৃহসজ্জার শত সহস্র উপকরণ, এই মহানগরীর বুকে যখন বিচিত্র সংঘটনে দেখা হয় প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার—তখনই প্রিয়াকে, প্রিয়ের মনে সাধ জাগে, এই নগরীর শ্রেষ্ঠ আভরণে শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সাজাবে সে। তাকে নিয়ে সে যে নীড় রচনা করবে সে নীড়টিকে সাজিয়ে তুলবে সর্বোত্তম সুদৃশ্য এবং আরামপ্রদ উপকরণে। প্রিয়ার মনেও সেই প্রত্যাশা জাগে—নিশ্চয় জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই এই মহানগরীর জীবনযুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে এবং নিজের সহায়হীন শক্তিকে স্মরণ করে মাথা নত করে সরে যায় পরস্পরের কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রিয়ার অপেক্ষা প্রিয়েরই বেশী। নারীর ভয় দূর করে পুরুষ, তার সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় পৌরুষে। এই লজ্জা আজ আত্মগ্লানি হয়ে বিমলকে পীড়িত করে তুলেছিল। সে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে—কেন সে পিনাকীর অরুণ্যার হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়তে পারলে না, কেন সে লাবণ্যকে নিয়ে ওদের মত বাসর পাততে পারলে না আকাশের তলায়? মনের এই অবস্থায় সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই স্থানটি। মানুষের কুৎসামুখর রটনা কাল থেকে যে প্রখরতর হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। আরও লাবণ্য এখন থেকে অপমানিত হয়ে চলে যাওয়ার পর এ স্থানটিও তার ভাল লাগছে না। এ ছাড়া আরও আছে। তার মাসিক আয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে। সে এখন স্বচ্ছন্দে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘর থেকে আট-দশ টাকা ভাড়ার ঘরে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত ভদ্র পল্লী—টিনের চালের পরিবর্তে—পাকা ছাদওয়ালা ঘর দশ টাকায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ঠিক এই কারণেই চিঠিখানা পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্যই উঠে পড়ল। বললে—চলুন।

শিল্পী হীরু সেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদগ্ধ সমাজের মানুষ, বর্তমানে সে সমাজের গণ্ডীকেও অতিক্রম করে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। হীরু সেনের চেহারায় শিল্পীজনোচিত একটা ছাপ আছে। পোষাকে—চুলছাঁটায়—চোখের দৃষ্টিতে এই ছাপ তিনি সযত্নে পরিচর্যা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সিগার মুখে হীরু সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। নূতন একখানি ছবির জন্যে তিনি এক মাড়োয়ারী প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সেই ছবির কথা ভাবছিলেন তিনি।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তিনি বিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছেন আপনি? ভাল হয়েছে। আমি কাজ আরম্ভ করতে চাই কাল থেকে।

বিমল ঠিক এই ধরণের পরিচয়-ভূমিকাহীন আলাপ প্রত্যাশা করে নাই। সে বললে—প্রদোষবাবু আমাকে লিখেছেন—

বাধা দিয়ে হীরু সেন বললেন—হ্যাঁ আমি তাকে বলেছিলাম। আপনার একটা লেখা আমি পড়লাম, ভাল লেগেছে আমার।

বিমল বললে—ও গল্প থেকে ছবি কি ভাল হবে বলে মনে করেন আপনি?

—না। ও গল্প থেকে ছবি নয়। গল্প আমার নিজের। গল্পটাকে ডেভেলপ করে ডায়লগ দিয়ে লিখবেন আপনি। আমি আপনাকে ডিরেকশন দেব অবশ্য। কাল থেকেই

লেগে যান আপনি। এই দেখুন গল্পটা।

একখানা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজে ইংরাজীতে টাইপ করা এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গল্প। একটি ধনী তরুণ তার তরুণী বান্ধবীকে নিয়ে মোটরে গেছে পল্লীভ্রমণে। সেখানে মোটর খারাপ হল। গাড়ীটা থেমে গিয়েছিল একটা গাছের তলায়। সেখানে গাড়ীটা মেরামত করছে ছেলেটি, এমন সময় গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটি মেয়ে। নিছক পল্লীবালা। সে গাছের উপরেই ছিল—কাঁচা আমের লোভে উঠেছিল, এমন সময় এসে থামল গাড়ী, গাড়ীটা যখন অনেকক্ষণ নড়ল না তখন সে না লাফিয়ে করে কি! সেই মেয়েটিই তাদের রাত্রে দিল আশ্রয়। তারপর আরম্ভ হল প্রেমের দ্বন্দ্ব। একদিকে পল্লীবালা অন্যদিকে আধুনিকা মধ্যস্থলে ধনী তরুণ। অবশেষে অবশ্যই জয় হল পল্লীবালার। মিলন।

বিমল পড়ছে গল্পটা এমন সময় হীরু সেন বললেন—আমি এই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম একটা chase দিয়ে open করলে কেমন হয়! মনে করুন ওই গ্রাম্য মেয়েটি একেবারে full of vigour প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ মেয়ে তো—ও ধরুন, আম পাড়তে গিয়ে একটি গ্রাম্য ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারলে এক চড় তার গালে—তারপর সে তাকে করলে তাড়া, মেয়েটি দৌড়ুল খাল ডিঙিয়ে বেড়া টপকে—ছুটল—এসে পড়ল একেবারে গাড়ীর সামনে। শহরের সোফিস্টিকেটেড মেয়েটি আঁতকে পা পিছলে একটা খানায় পড়ে গেল। শহরের ছেলেটি মানে নায়ক রাগে লাল হয়ে গ্রাম্য মেয়েটির সামনে দাঁড়াল। মেয়েটি হেসেই খুন। খিল খিল করে হাসি—রূপোর ঘণ্টার আওয়াজের মত হাসি। বুঝতে পারছেন—ছেলেটির মুখে রাজ্যের তেল কালি লেগেছে আর কি!

বিমল অবাক হয়ে হীরু সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরু সেন বলেই চললেন—তাঁর কল্পনার কথা। বললেন—কোন কিছু লিখবার আগে কল্পনায় দেখে নেবেন—ছবিটা কেমন হচ্ছে। ভিস্যুয়েলাইজ করতে হবে। এই ভিসন না থাকলে ছবির কাজ হয় না।

বিমল এবার গল্প লেখা ফুলস্‌ক্যাপখানি নামিয়ে রেখে বললে—এই ধরণের গল্প আমি কখনও লিখি না।

—লিখুন। লিখতে শিখুন। Filmএ এই হল গল্পের ধারা। আপনাদের সাহিত্যের ধারা—ওই যে সব তত্ত্বকথা—ও সব ছবিতে চলে না। আমরা ধরি মানুষের আদিম অস্তিত্বকে, I mean individual-কে। Individual lifeএ আছে শুধু Sex আর Hunger; Hungry People ছবি দেখে না। তাই ছবিতে Sexটাই হচ্ছে বড়। অবশ্য সাহিত্যেও Sex-এর স্থান ছোট নয়—ওই হল আদিরস। অর্থাৎ first; firstও বটে foremostও বটে।

বিমল বলল—আমি আপনাকে ভেবে বলব।

—ভেবে বলবেন?

—হ্যাঁ। ভাবতে হবে বই কি। এ কাজ আমার শক্তিতে কুলোবে কি না, রুচিতে ঠিক খাটবে কি না—ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

হীরু সেন তার মুখের দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কিন্তু সাহিত্য করে বাঁচতে হবে আপনাকে। এই শহরে থেকে শুধু সাহিত্য করে জীবিকার্জন করা অসম্ভব। সুতরাং এই রকম একটা পথ আপনাকে নিতে হবে। খবরের কাগজের চাকরি অথবা কিছু—অথবা এই Film-এর কাজ। এদিকে opening পাওয়া সহজ নয়। পয়সা এই দিকেই আছে। তা ছাড়া এই নূতন শিল্পটাকে আপনারা এসে যদি উন্নত করতে পারেন তবে সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড় কাজ হবে। এক বছরে—বিশ বছরের কাজ হতে পারে। একটা জাতকে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে আপনাকে।

এ সব কথার জবাব দেবার ইচ্ছা হল না বিমলের।

হীরু সেন বললেন—অবশ্য এই ছবির কাজে আপনাকে টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না আমি। কারণ contract হয়ে গেছে already। পরের ছবিতে আপনাকে পাইয়ে দেব। এ ছবিতে কোন উপায় নেই। আপনাকে আসতে হবে পর্যন্ত—মানে ট্রাম-বাস ভাড়া পর্যন্ত আপনার। আমার এখানে দশটায় খেয়ে-দেয়ে আসবেন। ছটা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে দু'চার কাপ চা আপনি পাবেন। তারপর হেসে বললেন—আমি খুব খোলাখুলি কথা বলি বিমলবাবু। আপনি অনেক কিছু প্রত্যাশা করবেন, শেষে আশাভঙ্গে আমার উপর দোষ দেবেন—এমন অস্পষ্টতা রেখে আমি কথা বলি না, বুঝলেন?

বিমল হেসে ঘাড় নাড়লে। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে সে বুঝেছে। এ কথা সে ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল। হীরু সেন নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন—তারপর বললেন—তা হলে কাল থেকে লেগে যান। এ ট্রেনিং আপনার জীবনে কাজে লাগবে। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই সব শিখে নিলে আপনার worth বাড়বে।

বিমল নমস্কার করে বললে—আমি তা হলে আসি।

কাল দশটা থেকে, বুঝেছেন? হীরু সেন জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন চুরুটটা। ওটাতে আর ধোঁয়া বের হচ্ছিল না।

বিমল ঘরের দরজার গোড়ায় এসে পড়েছিল। সে এতক্ষণে একটা বিড়ি খাওয়ার তাগিদ অনুভব করলে, পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতেই বেরিয়ে এল হীরু সেনের ঘর থেকে। নীচের দরজা অতিক্রম করে পথে নেমে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

হীরু সেনের কথাবার্তায় সে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছে। কৌতুক অনুভব করাই উচিত ছিল—কিন্তু তা অনুভব করা সম্ভবপর হয় নি। হীরু সেনের কথা বলতে তার চোখে পড়েছে হীরু সেনের চারিপাশের অবস্থা। গৃহসজ্জার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দারিদ্র্যের জীর্ণতার পরিচয় বিমলের চোখে পড়েছে। সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে ঘর এবং সিঁড়ির পাশের দেওয়ালগুলি। পেরেকে কণ্টকিত দেওয়ালগুলি ময়লা খান কাপড় পরা দরিদ্র মেয়ের বৈধব্য-দশার মত সকরুণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিমলের চোখে। বিমল অনুমান করতে পারে শিল্পী হীরু সেনের সমৃদ্ধির সময়ে এই প্রত্যেক পেরেকে টাঙানো ছিল ভাল ভাল ছবি। কত নামকরা বিদেশী শিল্পীর আঁকা ছবি, দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি, হীরু সেনের নিজের আঁকা ছবি। সে-গুলির আর একখানিও অবশিষ্ট নাই। কোথায় গিয়েছে সে অনুমান করতে বিমলের দ্বিধা

হল না। ঠিক এই কারণেই হীরু সেনের পারিশ্রমিক দিতে অক্ষমতার কথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি। ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল, অর্থকরী সাচ্ছল্যের প্রত্যাশা এখানে নাই।

খানিকটা দূর এসেছে এমন সময় পিছন থেকে তাকে কেউ ডাকলে। ফিরে দাঁড়াল বিমল। হীরু সেনের যে এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি তার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে-ই এগিয়ে এল। বললে—উনি আবার আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—বলুন।

—একটা কথা বললেন উনি। মানে ডিসিপ্লিনের জন্যে। ডিসিপ্লিনের জন্যে ওঁর সামনে smoke করা উচিত নয়।

বিমল স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—তার মানে?

এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি বললে—ওঁর ঘর থেকে বের হবার সময় বিড়ি বের করেছিলেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম।

—সেই জন্যেই কথাটা বলে দিলেন উনি।

—কিন্তু আমি তো—ওঁর কাজ আমি এখনও নিই নি। আর নিলেও উনি যখন কোন মাইনে দেবেন না—তখন মাইনে নেওয়া লোকের মত আনুগত্য উনি প্রত্যাশা করেন কি করে?

এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি এই উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে হতভম্ব হয়ে গেল। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

বিমল বললে—আপনি ওঁকে বলবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না।

বাসার দরজায় এসে সে বিস্মিত হল।

গোপেনদা বসে আছেন—প্রায় ফুটপাথের উপর। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্লটের সীমানা নির্দেশক C. I. T. লেখা একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছেন। বিমলকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

বিমল বললে—সিনেমা ডিরেক্টর হীরু সেনের লোক এসেছিল।

গোপেনদা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। বললেন—সিনেমা করতে যাচ্ছ? সর্বনাশ করলে ওই সিনেমাগুলো।

বিমল ঘরের দরজা খুলে বললে—ঘরে আসুন। চা খাবেন?

—খাব। নিয়ে এস চা।

দাদার দোকান থেকে কেটলী করে চা এনে কাপে ঢেলে গোপেনদাকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তারপর কি হুকুম বলুন।

গোপেনদা বললেন—প্রশংসা করতে এসেছি। তোমার গল্পটা খুব ভাল লেগেছে। মিহিরের বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছ সেইটের কথা বলছি। আর—। বিচিত্র তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমাদের একটা কাগজের ভার নিতে হবে তোমাকে। তুমি সমাজের সংঘাতটা ধরেছ। তাই তুমি কাগজের ভার নিলে আমি ভরসা

করতে পারি। আমরা কিন্তু কোন টাকাকড়ি দিতে পারব না।

বিমল বললে—আপনাকে ভেবে বলব দাদা। কয়েকদিন আমাকে সময় দিন।

—কয়েক দিন?

—আমার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল—এখানে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা বাসা বা মেস দেখে উঠে যেতে চাই।

—একটা মেস আছে। সেখানে থাকবে? সেখানে ছোট্ট একটা কুঠরী পেতে পারবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

—কোথায়?

—বউবাজারে। তবে বাড়ীটার একদিকে থাকে কয়েক ঘর বাঈজী, অন্যদিকে মেস। যাবে সেখানে?

## চৌদ্দ

বড়বাজার স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এরই উপর উত্তরদিকে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। ঠিক সামনে প্রকাণ্ড বড় একটা গির্জা। এ বাড়ীটাও বিখ্যাত বাড়ী। এককালে এটাই ছিল বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সারভেণ্টে'র আপিস। নীচের তলাটায় সবটাই এখন গুদাম, ঠিক রাস্তার উপরের ঘরখানাকে দুভাগ করে একটাতে হয়েছে জুতার দোকান অন্যটা হল আসবাবের দোকান। উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাড়ী, প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, তাই পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ বউবাজার থেকে বাড়ীটায় ঢুকতে গেলে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সদর দরজা পেতে হয়; সদর দরজার মুখেই কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি। বাইরে দরজার সামনে খানিকটা উঠানের মত খালি ইটে বাঁধানো জায়গা, তিন দিকে বস্তীর ঘরের মত সারি সারি ঘর; এখানে থাকে যত রিক্সাওয়ালা। উঠানে থাকে রিক্সাগুলি, খুপরীর মত ঘরগুলিতে থাকে রিক্সাওয়ালারা।

দোতলায় ছখানা, তেতলায় ছখানা—বারোখানা ঘরে মানুষ বাস করে। প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, সুতরাং সিঁড়িই বাড়ীখানাকে দুভাগে ভাগ করেছে। ঘরগুলি সাধারণ মাপের নয়, প্রকাণ্ড হল এক-একখানি। দোতলায় তেতলায় রাস্তার দিকের চারখানি ঘরেই থাকে বাঈজী। বাঁয়ের অর্থাৎ পিছনের দিকের দুই তলায় চার চার আটখানা ঘরে মেস হয়েছে। আটখানা ঘরে চারটি মেস। চারতলায় অর্থাৎ ছাদের উপর কাঠ দিয়ে তৈরী সারি সারি খুপরী ঘর, মেস এবং বাঈজীদের রান্না হয় এখানে, আরও কয়েকটা খুপরীতে থাকে কয়েকটি কৃশ্চান, যাদের ব্যঙ্গ করে সাধারণত বলা হয় চুনা গলির ফিরিঙ্গি।

বিমলকে মেস দেখাতে এনেছিল মিহির। গোপেনদা ভার দিয়েছেন মিহিরের উপর। দোতলার দুটি মেসের সঙ্গেই গোপেনদার সংযোগ আছে। একটি মেস সাধারণ মেস অর্থাৎ নানা ধরণের লোক এখানে থাকে। দালাল, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, একটু সচ্ছল অবস্থায়

কেরানী, দু' তিন জন অবস্থাপন্ন ছাত্র, গোটা দুয়েক বাড়তি জায়গাও আছে—মধ্যে মধ্যে মেস-বাসীদের আত্মীয় বন্ধু আসেন—দুদিন চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। খাওয়া-দাওয়া ভাল, অল্প দামের হলেও খাট টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবাবপত্র মেসের পক্ষে মূল্যবান বলতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে ফাউলকারী, তিনদিন মাটন, একদিন বাবড়ী। দিনে মাছ ছ'দিন—তাও ইলিস, রুই, ভেটকী প্রভৃতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে—এর উপরে মধ্যে মধ্যে আসে ডপ্‌সে। একদিন দিনে পায়েস মিষ্টি, রাতে নিরামিষ। অধিবাসীদের বিচিত্র গতিবিধি—শেয়ার মার্কেট ডালহৌসি তো কর্মক্ষেত্র, এ ছাড়া চাঙোয়া, ব্রিস্টল, মন্টিমার্লে থেকে ফুটবল মাঠের গ্যালারী, ফিল্ম স্টুডিয়ো এবং থিয়েটারের গ্রীনরুম পর্যন্ত যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়। সিগারেট ছাড়া বিড়ি এ মেসে নিষিদ্ধ, এ বিষয় কড়া আইন আছে। এদের মেসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দু'একজন আছেন যাঁরা গোপেনদার ভক্ত, গোপেনদার সংকেত বহন করে নিয়ে যে আসে—তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমাদরের সঙ্গে আত্মীয় পরিচয়ে ওই বাড়তি সিটে স্থান করে দেন। আত্মীয়ের খরচ নিজেরাই বহন করেন। প্রয়োজন হলে আত্মীয়কে টাকাও ধার দিয়ে থাকেন। মেসে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ম্যানেজারের নাম আছে, আগন্তুকের সম্পর্কে প্রয়োজন হলে গোপেনদার কাছ থেকে নির্দেশ আসে, প্রয়োজন হলে এঁরাও জেনে নেন ব্যক্তিটি সম্পর্কে এঁদের কর্তব্য।

বিমলের থাকবার ব্যবস্থা এ মেসে করেন নি গোপেনদা, তা হলে মিহিরের আসবার প্রয়োজন হত না, তিনি টেলিফোনে বলে দিতে পারতেন। বিমল সম্পর্কে একটু বিচিত্র ধরণের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। সেই কারণেই মিহিরকে আসতে হয়েছে। বিমল থাকবে চারতলার ছাদের ওই সারিবন্দী রান্নাঘর ও ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের ঘরেরই একপাশের একটা ঘরে। ঘরখানা বাড়ীওয়ালার নিজের প্রয়োজনে লাগে বলে ভাড়া দেওয়া হয় না। বাড়ী মেরামতের সময় ঘরটায় চুন সিমেন্ট থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠ, ইলেকট্রিক লাইনের কেসিং, তার, জাল, রঙ এই ধরণের জিনিস রাখা হয়, মেরামতের পর পড়ে থাকে রঙের খালি টিন, ভাঙা দরজা-জানলার দু'একটা টুকরো, পুরানো ইলেকট্রিক লাইন কেসিংয়ের অংশ, বাতিল সুইচবোর্ড, জলের পাইপের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া জলের কলের কক; আরও দু'চারটে জিনিসও থাকে। মেরামতের পর কিছু দিন থাকে—তারপর ক্রমে ক্রমে জিনিসগুলি কমতে সুরু হয়। বাড়িওয়ালার দারোয়ান, সরকার এরা কিছু বিক্রি করে দেয়, মেসের ঠাকুর, চাকর এবং ওই ফিরিঙ্গি বাসিন্দারাও জানালাটা বিচিত্র কৌশলে খুলে—আঁকশী দিয়ে কতক কতক বের করে ঘরখানাকে পরিষ্কার করে ফেলে। বাড়ীওয়ালা এ সবই জানেন কিন্তু—জুতো পরলে নখের কোণের ব্যথার মত এ হল বাড়ীর মালিকানি স্বত্বের অনিবার্য উপেক্ষণীয় ব্যাধি—এ নিয়ে কোনদিন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টা করেন না। বাড়ীওয়ালা কলকাতার প্রাচীন সম্পত্তিশালী বংশের সন্তান, স্বাভাবিক ভাবেই মিহিরদের বাড়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। আছে বলা অবশ্য ভুল, ছিল বলাই ঠিক। প্রবীণ বাড়ীওয়ালা মিহিরকে চেনেন—স্নেহও করেন, সেই পরিচয়েই মিহির অনেকবার এসে এই ঘর খানি দু মাস চার মাসের জন্য ভাড়া পেয়েছে। ভাড়া দশ টাকা। ভাড়ার গোলমাল আজও

কখনও হয় নি। সুতরাং মিহির এসে বলতেই চাবিটি তার হাতে দিয়ে বলেন—ঘর বোধ হয় পরিষ্কারই আছে, দু'চারটে ভাঙা টিন কি কাঠের টুকরো থাকলে এক কোণে ঠেলে দিয়ো। অসুবিধে হলে—বের করে ফেলে দিয়ো, কেউ-না-কেউ বিক্রী করে দেবে।

মিহির ঘরখানা খুলে দিয়ে বললে—নেহাত খারাপ নয়, আপনি যেখানে ছিলেন—তার চেয়ে ভাল হবে! ঘরখানা বড়ও বটে।

—গৌরবে তো অনেক বড়। চারতলা।—আলো চাই—চাই মুক্তবায়ু দাবীটা ষোল আনা মিটে গেল। হাসলে বিমল।

মিহির চকিত হয়ে বললে—ঘরখানা কি—? মিহির অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। রসিকতা, কৌতুকের অংশ তার জীবনে অত্যন্ত কম। তার উপর সদ্য পিতৃবিয়োগের আঘাতে সে স্বল্প অংশ আরও স্বল্প হয়ে গিয়েছে।

বিমল বললে—না-না। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে—অন্তত বাংলা দেশের একজন নামহীন নূতন লেখক—এর চেয়ে ভাল কি কল্পনা করতে পারে বলুন? আমি ওটা রসিকতা করলাম।

এবার মিহির একটু হাসলে, বললে—আমি প্রায় মা কালীর মানসিক অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছি না বিমলবাবু। এমন জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আপনি তো আমাদের বাড়ীর কথা জানেন। আবার একটু হাসলে সে। হেসে বললে—বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন ভারী ভাল লেগেছে আমার। এর মধ্যে আমি কয়েকবারই পড়েছি। যখনই বাবার জন্য মন খারাপ হয়—গল্পটা পড়ি। যাক চলুন, এইবার আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।

দোতলার দ্বিতীয় মেসটায় বিমলের খাবার ব্যবস্থা করেছে মিহির। প্রথম মেসটার সঙ্গে বিমলের কোন সম্বন্ধ থাকে—গোপেনদা চান না। তাঁর নিজের দলগত কোন সাবধানতা এর মধ্যে আছে কি নেই সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেও বিমলের নিজের কাছেই নিজে অপরাধ অনুভব করে। মিহির বললে, ওদের সংস্রবে আপনি পড়েন—এটা গোপেনদা চান না। ওদের কথা তো বলেছি আপনাকে। ওদের অধিকাংশ হল snob, আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তা ছাড়া ওদের মেসের চার্জ বেশী। এ মেসটা গরীব কেরানীদের মেস, চার্জ কম, এদের সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগ স্বল্প কিন্তু সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা করে। সাহিত্যিকেরা যে ওদের চেয়ে পণ্ডিত এটা ওরা বিশ্বাস করে ধনীর ভাগ্যের মত। আপনাকে বিরক্ত করবে না, তর্ক করবে না, বড় জোর দু'চারখানা বই পড়তে চাইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্প শুনতে চাইবে। হয়তো আধুনিক নামকরা লেখকের কথাও শুনতে চাইবে। তবে একটি বিষয় সাবধান করে দি। কদাচ গোপেনদার নাম করবেন না কি কোন বিপ্লবী কর্মীর নাম করবেন না, তা হলে আপনাকে আর কাজকর্ম করতে দেবে না।

একটু থেমে হেসে আবার বললে—এবং গোটা কলকাতায় রটিয়ে দেবে যে, সাহিত্যিক বিমলবাবু উপরে সাহিত্যিক হলেও ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক অ্যানার্কিস্ট, টেররিস্ট, রেভলুশ-

নারিস্ট, যেটা জিভের ডগায় আসবে বলে দেবে। আপনার সম্পর্কে গৌরব করেই বলবে, তার ফলে যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তবে আপনার উপর শ্রদ্ধা বাড়বে। কিন্তু শুধু যদি সার্চ করে ক্ষান্ত হয় তা হলে বিপদ, তখন আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

বিমল বললে—জানি।

মিহির মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। মেসটির সঙ্গে মিহিরের জানাশুনা বা যোগাযোগ বিচিত্র। ম্যানেজার তাকে খাতির করলে বাড়ীওয়ালার মত, অফিস-মাস্টারের মত। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস এটি। মফঃস্বলের কোন ধনী ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠান। হরেক রকম ব্যাপার। অর্ডার সাপ্লায়িং, স্টিভাডোর, কয়লাখনি, কণ্ট্রাকটারি, ব্যাঙ্কিং এবং ইনসিওরেন্স। জন তিরিশেক কর্মচারী সমস্ত বিভাগের কাজ চালায়, তার মধ্যে বিশ জন থাকে এই মেসে। বাকী দশ জন কেউ বা বাসা করে থাকে, কারও বাড়ী কলকাতায়, কেউ কেউ অন্য মেসে থাকে। এই মেসের বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় আপিস থেকে, ঠাকুরের বেতনও আপিস দেয়। আপিস থেকে আরও একটা টাকা পাওয়া যায়—গেস্ট চার্জ হিসাবে,—তার জন্য মফঃস্বল থেকে মালিকের কর্মচারী যারা আসে—তারা থাকে খায়—চলে যায়। কোন বাইরের লোক নেওয়া সম্পর্কে আপিস থেকে নিষেধ আছে; তবে মিহিরবাবুর বন্ধুর সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা। বাড়ীওয়ালার মত এই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গেও মিহিরদের পরিচয় পরিবারগত; মালিকদের একটি ছেলেও মিহিরের বন্ধু, সুতরাং পার্থিব জ্যামিতিক নিয়মানুযায়ী মিহির মালিকের পুত্রের মতই শ্রদ্ধেয়। এবং মিহিরই এই ঘর দুখানি ভাড়া করে দিয়েছে আপিসের মালিককে।

ম্যানেজার বললেও সে কথা—দেখুন দিকি, আপনার বন্ধুলোক—তার সম্বন্ধে কথা আছে? তা বেশ! খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া উনি শুধু খাবেন আমাদের এখানে। থাকবেন তো আলাদাই, আমাদের মেসে তো থাকছেন না। তা বেশ!

মেসটি প্লেন লিভিংয়ের একটি চরম দৃষ্টান্ত স্থল। দেওয়াল ঘেঁষে মাথার দিকে বা পাশে একটি বা দুটি সুটকেস—তার পাশে মেঝের উপরেই মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে সিট। আসবাব দূরের কথা—কাপড় জামা রাখবার ব্যবস্থা এখানে দেওয়ালে পেরেক পুতে।

খাওয়ার ব্যবস্থা—ভাত ডাল তরকারী দুটো—আর দুখণ্ড মাছ—তার সাইজ একেবারে মাপা। এর উপরে আপন আপন ব্যবস্থা যার যেমন খুশী করতে পারে, করেও। কয়েকজনই সকালে চা খেয়ে ফেরার পথে নিয়ে আসে চার পয়সার দই, সন্ধ্যায় ফেরার সময় চার পয়সার বা ছয় পয়সার রাবড়ী। দু'তিনজন আছে, তারা মধ্যে মধ্যে রেস্তোরাঁ থেকে কোয়ার্টার ডিস কারী এনেও খেয়ে থাকে। মাসে একদিন হয় মেসবরাদ্দ মাংস। যাই হোক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা থেকে অনেক ভাল; আরও একটা সুবিধা হল—পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—উভয় বঙ্গের লোকের রুচির দ্বন্দ্বের আশ্চর্যরকম একটা মীমাংসা আছে এখানে। লঙ্কা এখানে পরিমিত। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা আসে যথেষ্ট, পরিমিত ঝালের বেশী ঝাল যার পক্ষে

রুচিকর—সে যতগুলি ইচ্ছে কাঁচা লঙ্কা পারে। এ দিক থেকেও বিমল খানিকটা আরাম পেলে। শুধু অসুবিধা হল একটি। দিনের বেলা দশটা বাজা মাত্র এখানে রান্নাঘরে অল ক্লীয়ার বেজে যায়। মেসের ঠাকুর আপিস থেকে মাইনে পায় সাধারণ ঠাকুর থেকে ছ সাত টাকা বেশী, তার জন্য দশটা বাজতেই তাকে বের হতে হয় আপিসের কাজে।

একটু অসুবিধা স্বীকার করেই তারও মীমাংসা হয়ে গেল। স্থির হল খাবার ঢাকা দিয়ে সে উনোনের উপর রেখে যাবে। বিমল প্রয়োজনমত নিজে নামিয়ে নেবে। চাকর একজন আছে, কিন্তু তার ছোঁয়া-নাড়া এ মেসে অচল। ম্যানেজার নিজে জাতিতে সদ্‌গোপ এবং আর এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক—যার-তার ছোঁয়া নিজেরাও খান না, অন্য কাউকেও খেতে দেন না। এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষে আছে প্রবলতম সমর্থন যাকে অন্য কেউ উপেক্ষা করতে সাহস করে না। মালিকপক্ষের সমর্থন আছে। মালিক ঠিক নয়, মালিকের গৃহিণী এবং মালিকের পুত্রের। এরা দুজন গোঁড়া হিন্দু। মালিক নিজে এসব মানে না। গৃহিণী স্বামীকে সংশোধন করতে না পেরে পুত্রকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে এবং তাদের আয়ত্তাধীনে রয়েছে বিষয়সাম্রাজ্যের যে খণ্ডটুকু তার উপর চালিয়েছে এই পবিত্র সংস্কার আন্দোলন। তবে যদি কেউ বাইরে অখাদ্য খায় বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করে, তার জন্য আইনের কোন কড়াকড়ি নেই। এমন কি কেউ যদি চাকর মারফৎ ফাউলকারি কি এগ্‌পোচ আনিয়ে রান্নাশালার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে খায় তাতেও নিষেধ নেই। কারণ সাম্রাজ্যবাদী হলেও যুগ এবং স্থান সম্পর্কে তাদের চেতনা যথেষ্ট আছে। এটা বিংশ শতাব্দী এবং কলিকাতা মহানগরী—এখানে চাকরি গেলে মানুষ কষ্টে পড়ে কিন্তু আবার পায় এবং চাকরি গেলেই চাকরে মালিকে কোন তফাৎ থাকে না। মেসের ঘরভাড়া ঠাকুরের মাইনে এই দুটো দিয়ে সংস্কার আন্দোলন ওর বেশী আর চালানো যায় না। শুধু রান্নাঘর উনান এবং বাসন সম্পর্কে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এ অসুবিধাটুকু স্বীকার করে নিলে বিমল।

ম্যানেজার বললে—দেখবেন মশাই, কেউ থাকবে না বলে চাকরকে ছোঁয়ানাড়া করাবেন না!

বিমল হেসে বললে—না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। সে আমি করব না।

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক আপনি। তার উপরে লেখক মানুষ—আপনি করবেন কেনে এমন? তবে—। একটু চুপ করে থেকে বললে, আপনাকে তো বলতে হবে না, পাপ মানে না আপন বাপ, ঠিক একদিন দাঁত বার করে আপন চেহারাটি 'দেখায়ে' দেবে। প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

ম্যানেজারের বাড়ী বর্ধমান জেলার আসানসোল সাবডিভিশনে। বাঁকুড়ার সীমার কাছাকাছি। ম্যানেজারের গুণ্ডচর আছে। ওই যে তিনটি কালো মেয় থাকে এখানে—তাদেরই এক বৃদ্ধা ম্যানেজারের চর। বুড়ীকে সকলে আদর করে—ম্যাগী বলে ডাকে। কথাটা মাগী। য-ফলার নেকটাই পরিয়ে চতুর রূপান্তরে কথাটাকে সাহেবী করে নেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার ওকে বলে 'আন্টি' অর্থাৎ 'মাসী'। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ম্যানেজার রান্নাঘরে রান্নার তদ্বির করতে এসে আন্টির সঙ্গে গল্প করে। আন্টি তিনটে ভাষা জানে—ইংরিজী হিন্দী বাংলা!

ভিনটেতেই সমান দখল। ম্যানেজারের পর্যায়ের বাঙালীরাও ঠিক ওই তিনটে ভাষা জানে এবং এক বাংলা ছাড়া বাকী দুটোতে ওই ম্যাগীর সমান দখল। সুতরাং কথাবার্তায় কোন অসুবিধা হয় না।

বুড়ীর সঙ্গেই প্রথম আলাপ হল বিমলের। এখানেই একখানা তক্তপোষ দুটো সেল্‌ফ একখানা সস্তা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার কিনে ঘরখানায় আস্তানা পেতে ফেললে। মনোহর-পুকুর রোডের জিনিসগুলো চিত্তর জিম্মায় রেখে এসেছে, সেগুলো সে তার সুবিধামত একদিন পৌঁছে দেবে। লরীর ব্যবসায় আছে, লরী যেদিন এ অঞ্চলে ভাড়া পাবে সেদিন বোঝাই মালের সঙ্গে তার সেই পুরনো সোফা আর চেয়ার—এই দুটোকে শাকের আঁটির মত এনে ফেলে দিয়ে যাবে। মেসের চাকরটার নাম পঞ্চানন, নিরীহ ধরণের মানুষ—বয়সে প্রৌঢ়—সে তাকে সাহায্য করলে। তার হাতে একটি সিকি দিয়ে বিমল ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে মহানগরীর চারতলার উপর বিপুল তৃপ্তি নিয়ে বসে পড়ল। মনে মনে ধন্যবাদ দিলে, প্রণাম জানালে গোপেন দাদাকে।

বুড়ী ম্যাগী বারকয়েক তার সামনে দিয়ে পায়চারি করে অবশেষে তার কাছে এসে দাঁড়াল।—গুড ইভনিং।

বিমলও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ী বললে—মি লিভ ইন স্থাত রুম। সে হাসলে। বুড়ী ম্যাগীর একটিও দাঁত নেই। চুলগুলো শনের নুড়ি হয়ে গেছে। তাতে বাঙালী ধরণেই একটা ছোট লাট্টুর মত গোঁজা খোঁপা বেঁধেছে। পরনে ময়লা রঙীন ঝলঝলে পা পর্যন্ত লম্বা সেমিজের মত একটা জামা। গাউন সেমিজ যা খুশী ওটাকে তাই বলা যায়। পায়ে একটা ছেঁড়া নেকড়ার চটি।

এর পর বুড়ী গলগল করে একগঙ্গা কথা বলে গেল। তার অল্প কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া বিমল আর কিছু বুঝতে পারলে না। বিপদে পড়ল সে। ইংরিজীতে সে পারদর্শী নয় কিন্তু কাজ চালাতে কষ্ট হয় না; ইংরিজী বইও পড়েছে, তার মধ্যে গ্রাম্য প্রাকৃত চরিত্রের মুখের ভাষা—ডান্‌ নো জাতীয় সংলাপ পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে তার দেশের অনুরূপ জনের মুখের 'মুই জেনে না' কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই মহানগরীর এই স্তরের কালো সাহেবদের সঙ্গে তার পরিচয় নূতন—তার বুড়ী দন্তহীন, তার কথা অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত মনে হল।

বুড়ী কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলিকে প্রকট করে বললে—এ্যাংলি? গেডিং এ্যাংলি?

এবার বিমল বুঝলে কথাটা। বুড়ী ধরে নিয়েছে বিমল তার কথা শুনে রুষ্ট হয়ে নিরুত্তর রয়েছে। সে মিষ্ট করে বললে—নো—নো—নো।

—নো?

—না। বাট্‌ ইউ'ল প্লিজ এক্সকিউজ মি, আই অ্যাম সরি, আই কাণ্ট ফলো ইউ।

বুড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল, নো নো। নো ফলোয়িং? বলেই সে তাড়াতাড়ি আপন ঘর থেকে একটা মোড়া এনে সামনে বসে বললে—ইউ সিত দাউন। মাই লুম বেরী দার্তি।

বিমল বুঝলে বুড়ী 'ফলো' কথাটা অন্য ভাবে ধরেছে। সে আবার বললে, আই কাণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ। তারপর হিন্দী করে বললে—সমঝমে নেহি আতা।

বুড়ী হেসে সারা হয়ে গেল। তারপর নিজের মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—নো তিথ। বেরী ওল্ড। তারপর বিচিত্র বাংলায় বললে—বাংলা বুলি জানে। বাংলা বাত বোলো মহাশা। বলেই আবার হেসে খুন।

বিমলও হাসলে। বুড়ী আশ্চর্য রকমের অনাবিল হাসি হাসছে। বিমলের মনে তার স্পর্শ সংক্রামিত হয়েছে। হেসে বিমল বললে—বাঃ, তা হলে তো খুব জমবে। বাংলা জানেন আপনি?

—জানে না? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে বুড়ী,; তারপর হেসে চুপি চুপি বললে—জানে। বোলে না।

—কেন? বলেন না কেন?

বুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে—সাহিব পিউপিল দোস্ত লাইক ইত। দে হেত ইত। নেতিব নেতিব।

বিমল হাসলে। বুড়ী সত্য কথা বলেছে।

বুড়ী আবার বললে—ইউ হেত আস।

বিমল চমকে উঠল। বুড়ী ঠোঁট উলটে ক্ষোভের সঙ্গে বললে—মেস বাবুজ কল মি ম্যাগী। হামি জানে মহাশা ম্যাগী কিস্‌কে বোলে! হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বললে বুড়ী, মাগী বালী যাবি? দি মাগীজ লিভ হিয়া, বিলো বিলো। হাতের আঙুল নীচের দিকে করে দেখিয়ে বার বার বুঝিয়ে দিলে বাইজীদের কথা বলছে সে। অর্থাৎ মাগী কথাটার অর্থ সে জানে। তারপর বললে—ম্যানেজার স্যাত কেলা কল যি 'অস্তি', মাছী মাছী! আই নো, নো! হাসলে সে।

বিমল লজ্জায় নীরব হয়ে বসে রইল।

বুড়ীও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—পুওল উয়োম্যান। নো বদি ইন্ দি ওয়ালড। আই স্মাইল—লাফ। হাত দুটো উল্টে দিলে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ী বললে, ইউ হু হোয়াত? কোন কাম করেন মহাশা। বিজিনেস?

বিমল বললে—আই এ্যাম এ লিটারেচার। নভেলিস্ট।

—হোয়াত?

—নভেলিস্ট, স্টোরি রাইটার। আই রাইট নভেলস, শর্ট স্টোরিস—

—তোরিজ নভেলস? বুড়ীর বার্ধক্যম্লান হলুদ রংয়ের স্তিমিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।—ইউ রাইত স্তোরিজ? হোয়াত স্তোরিজ? ঘোস্তস?

—নো নো। আই রাইট স্টোরিজ অব রিয়েল লাইফ।

—ইউ গেত মনি? দে গিভ ইউ মনি?

—ইয়েস।

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আই হ্যাভ নো মনি। আই নেভা বাই বুকজ। আই দোন্ত রিদ্ বুকজ। গত্ ওনলি ওয়ান বুক—হোলি বাইবেল। দোন্ত রিদ ইভ। তাচ্ ইভ্ অন দি হেদ। বুড়ী মাথায় হাত দিলে। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে—অন দি ব্রেস্ত। কিস্ ইভ।

বিমল বললে—হোয়াই ডোন্ট ইউ রিড ইওর হোলি বাইবেল?

—কান্ত রিদ। কান্ত সি। অলমেস্ত ফংগেতন রিদিং। উদাস ভাবে সে চেয়ে রইল সম্মুখের কলকাতার প্রাসাদশীর্ষময় শূন্যলোকের দিকে। সূর্য পশ্চিমের দিগন্তে বোধ হয় ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে ডালহৌসি স্কোয়ারের চারতলা পাঁচতলা বিশাল বাড়ীগুলির অন্তরালে দিগন্ত দেখা যায় না। জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, চার্চের মিনার, লাটসাহেবের বাড়ীর গম্বুজ দেখে ওগুলিকে চেনা যায়। স্টেটসম্যান আপিসের পাশে ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় কালো গোলকটাকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে জোড়া গির্জের মাথা দেখে চেনা যায়। বউবাজার ধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সামনে পুব দিকে শেয়ালদার মোড়ে আর একটা গির্জে দেখা যাচ্ছে। এদিকে অর্থাৎ উত্তরে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়াগুলি দেখা যাচ্ছে।

মধ্য কলকাতার বউবাজার।

কলকাতার প্রাচীনতম স্থান। ইংরেজ মহানগরী নির্মাণকালে কি কল্পনা করেছে তার নিদর্শন এখানে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। ওই গির্জের মাথা, বউবাজারের পাশে চার চারটে গির্জের চূড়া। বিমলের সামনে বসে রয়েছে—

বুড়ী উঠে পড়ল হঠাৎ। বললে—আই গো নাও। আই গো। ইউ আর এ গ্রেত ম্যান। রাইত বুকজ। গেত মনি। গ্রেত ম্যান। ইওর নেম? আপনার নাম কি মহাশা—

—বিমল মুখার্জী।

—বিমল? গুড। বেরী সুইত। বেরী সুইত!

—এক্সকিউজ মি, ইওর—

—মাই নেম? বুড়ী হেসে বললে—কল মি ম্যাগী অর অন্তি। দে অল কল মি স্যান্ত।

বিমল বললে—নো। আই স্যাল কল ইউ মা-মি।

মুহূর্ত কয়েকের জন্য বুড়ী যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর আবার আগের মতই বললে—ইয়েস। এনি নেম ইউ লাইক। স্যাতস গুড। ইউ কল মি মা-মি, আই কল ইউ মাই সন্। স্যাতস গুড। বলতে বলতে সে সচকিত হয়ে উঠল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠছে। একজন নয়, দুজন তিনজনও হতে পারে। বুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললে—অ—কেটি কামিং উইদ ফ্রেন্দস। অ—টি নট রেদি। অ—

ঠিক পরক্ষণেই এসে দাঁড়াল এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী কালো মেম সাহেব।

তার সঙ্গে—বিমল বিস্মিত হল—ডিরেক্টর হীরু সেনের দুজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

## পনর

ষীক সেনের সহকারীদের সহজে চেনার উপায় ছিল না। ওরা বিমলকে দেখে না চমকালে বিমল হয়তো ওদের চিনতেও পারত না এবং চিনতেও চাইত না। একেবারে বউবাজার অঞ্চলের ম্যাগী ও কেটিদের গোষ্ঠীর খাঁটি পিটার-গোমেস সেজে এসেছে তারা। শুধু অবস্থাটা একটু ভাল বলে মনে হয়। সম্ভবত ফিল্ম কোম্পানীর মেকআপ রুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই সাজসজ্জা ভঙ্গি এমন নিখুঁত হয়েছে। বিমলকে দেখে ওরা চমকে উঠতেই বিমল ওদের দিকে ভাল করে তাকালে। মনে হল চেনা মুখ। উপরের দিকটা অর্থাৎ কপালের উপর ফেল্ট হ্যাট বেশ একটু বেশী করে বেঁকিয়ে টানা থাকায় এবং চোখে রঙীন চশমা থাকায় উপরের দিকটা চেনা বলে মনে হয় না কিন্তু নীচের দিকটা দেখে চেনা মনে হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদেরই একজন হেসে টুপিটা কায়দা করে খুলে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বললে—গুড্ ইভ্নিং মিস্টার মুকুর্জী? তারপরই সে চোখের চশমাটা খুলে ফেললে। তার দৃষ্টান্তে অপরজনও টুপি চশমা খুলে একটু হেসে বললে—আপনি এখানে?

কেটি মেয়েটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওদের দুজনের হাসি এবং প্রশ্নের অন্তর্নিহিত রঙ্গ বা ব্যঙ্গকৌতুকের সরসতা বাক্য কয়েকটি মূল অর্থকে অতিক্রম করে আরও অনেকগুণ অর্থবান হয়ে উঠেছে। বিমল একটু হেসে বলতে গেল—আমি এখানে ক্ষণিকের বা দুই দণ্ডের অতিথি নই—আমি—। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলে, শুধু বললে—আমি এখানকার বাসিন্দা হয়েছি সম্প্রতি। নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে—এই ঘরখানাই আমার বাসা এখন।

দুজনেই ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। বিমল বললে—বসবেন? কিন্তু আমার ঘরে বসতে দেবার মত আসন আর নেই।

একজন একটু ঢোক গিলে বললে—না। ব্যস্ত হবেন না আপনি।

ম্যাগীর মতই কেটি বাংলা বুঝতে পারে। সে সবই বুঝছিল। প্রথমটায় বন্ধুদের সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকে উদ্বুদ্ধ হতে দেখে সে অধিকতর সরস কিছুর প্রত্যাশায় ঠোঁটের চাপের মধ্যে মৃদু হাসি শিথিল যোজনায় যোজিত করে প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যাশা করছিল এরা এইবারই বুঝি বলে—লেট মি ইনট্রোডিউস্ আওয়ার সুইট কেটি টু আওয়ার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড এণ্ড কমরেড। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ বিলুটী চটা শীসের বাটের মত পরিণতি লাভ করতেই সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে গম্ভীর মুখে গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে সরু গলায় চীৎকার করে উঠল—ম্যাগি! এ! ডোণ্ট ইউ হিয়া—র? ম্যা—গি!

বুড়ী নিজের ঘরের ভিতর থেকেই চীৎকার করে উঠল—হো-য়া-ই ডু ইউ—? ন্যাকড়া দিয়ে একটা ডিস মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এল। কেটি ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকেছে। বুড়ী খুব রেগে গেছে—সে নিজের জরাজীর্ণ দেহখানাকে অন্তরের ক্ষোভের তরঙ্গে আন্দোলিত করে অঙ্গ দুলিয়ে কেটির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।—হো-য়া-ই ডু ইউ তক লাইক দ্যাত? মি এ মেদ সায়বেন্ত? এঁ?

বুড়ীর সঙ্গে বিমলের গ্রামের কুঁদুলী পাচী পিসীর কোন পার্থক্য নাই।

হীরু সেনের সহকারীদের একজনের নাম রতু রায়, অপরজনের নাম মণ্টু বোস। রতুর আসল নাম রতন হলেও হতে পারে, মণ্টুর নাম অনুমান করার উপায় নাই। চিত্রজগতে ওই ধরণের কাটাছাঁটা নাম একটা স্টাইলও বটে এবং প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপনও বটে। সে কথা থাক। ওদের দুজনের মুখেই একটু একটু ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বললে—কেটিকে আমরা ছবিতে নেব। একটা ফিরিঙ্গী নার্সের পার্টে নামাব। হাসতে লাগল রতন রায়।

মণ্টু বোস বললে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়। কিন্তু কতক্ষণ? পিসী যদি পাতের কাছ থেকে না ওঠে? আমি ওসব ভালবাসি না।

রতু বললে—এই মণ্টু!

—ও—নো। শুনুন স্যর। আমরা কেটির এখানে বেড়াতে এসেছি। আমাদের গার্ল ফ্রেণ্ড; আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন! ডোণ্ট ড্রিঙ্ক মিল্ক উইথ ফিনুক—। রাগ করবেন না যেন।

বিমল বললে—না-না। রাগ করব কেন? বেশ তো, বান্ধবীর কাছে এসেছেন—তাতে—

বুড়ী কেটির সঙ্গে কথা শেষ করে গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে গেল—হাউলিং বার্কিং লাইক এ বিচ। কলিং মি ওল্ড উইচ—ইউ ব্ল্যাক ক্যাট—। ইউ দতার অব এ সোয়াইন—হালামজাদী—এক লোজ তুম সমঝেগা।

বুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টং—টং—ঠং—ঠং শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে তুললে। খুব ক্রুদ্ধ হয়েই কাজ করে যাচ্ছে বুড়ী। কাপ ডিস নামাচ্ছে—সাজাচ্ছে।

কেটি বুড়ীর গালাগালির জবাব দিল না কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে এদের দুজনকে বললে—উইল ইউ কাম ইন অর টক ননসেন্স উইথ হিম অল দি টাইম?

মণ্টু বোস ঘরে গিয়ে ঢুকল। রতু বললে—আপনি এখানে কেন বাসা নিলেন স্যর? এত জায়গা থাকতে বৌবাজারে—চামড়ার গুদোমের গন্ধের মধ্যে—বাইজী—ফিরিঙ্গী মাগীদের মধ্যে—আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি!

বিমল কপালে হাত দিয়ে বললে—অদৃষ্ট বলতে পারেন অথবা মহানগরীর আবর্তের আকর্ষণ বলতে পারেন। বাইজীর কথা জানতাম—তারা একপাশে থাকে—মেস একপাশে। কেটিদের কথা জানতাম না। অবশ্য জানলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

—এদের লাইফ ষ্টাডি করবেন বুঝি?

—না। না। নেহাৎ স্থান সমস্যাতেই সম্ভবত অদৃষ্টের ফেরে এসে পড়েছি এখানে।

মণ্টু এবং কেটি বেরিয়ে এল, কেটি এবার মাথায় একটা রঙীন রুমাল বেঁধেছে এবং ঠোঁটে গালে আর এক পোঁচ রঙ চড়িয়েছে। সে দরজায় তালা বন্ধ করে ম্যাগীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মণ্টু রতুকে হাত ধরে আকর্ষণ করে বিমলকে বললে—চললাম স্যর!

কেটি আগেই গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মণ্টু হেসে বললে—কেটি আপনার

উপর চটে গেছে। আমাকে বললে—হোয়াই হ্যাভ হি কাম হিয়ার? বললে, সব জাগামে তুমলোক আয়েগা তো হামলোক কাঁহা যায়েগী?

হাসতে হাসতে তারা কেটির অনুসরণ করলে। সিঁড়ি থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—ঈ—! হোয়াট—দি—হেল—ইউ আর টকিং? ঈ—!

বুড়ী বেরিয়ে এসে কয়েক মুহূর্ত ওই সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিমলের কাছে এসে বললে, মাই সন্! গো এ্যাওয়ে ফ্রম হিয়া। ব্যাড্ প্লেস—বেরী ব্যাড্! স্যাত গাল্—স্যাত কেটি—দত্তাল্ অব এ সোয়াইন—হালামজাদী কুত্তি। বহুত কুত্তি হিঁয়া আতা হায়। দে আর বেরী বেরী ব্যাড্ ম্যান। দেঞ্জারাস পিউপুল। কাম উইথ বিগ নাইফ। সাম্ তাইমস দে ড্রাঙ্ক। স্যাত বিচ ওয়াজ কার্সিং ইউ। আস্কড মি—হোয়াই হি হিয়া? হোয়াই? দিসতারবিং আস? হোয়াই? আ—! লাইক বহুরানী অব বহুবাজার! অল, অল হাল্ ফাদারস পপাটি, হাল হাজব্যাণ্ড পপাটি!

বকতে বকতে ঘরে ঢুকে একটা সস্তা টি-পট হাতে বেরিয়ে এসে বললে—লুক—লুক হিয়া মাই সন্। ওয়ান পত ফুল তি—অল বরবাদ্।

বুড়ী ওদের জন্ম চা করেছিল—কিন্তু কেটি বন্ধুদের নিয়ে চলে গেল, পুরো এক টি-পট চা বরবাদ হয়েছে।

বুড়ী কেটির কেউ নয়। মাসীর সইয়ের বোনপো বউয়ের বোনঝি কি ওই ধরণের সম্বন্ধ একটা আবিষ্কৃত হয়েছে জীবনের এত তরুণীতে ভাসতে ভাসতে। বুড়ীর নেই কেউ। জীবনে সে বিবাহই করে নি। বুড়ীর আসল নাম মিস অ্যানা কুক। প্রথম জীবনটা কেটেছে বহু উন্মাদনার মধ্যে। বউবাজার সংলগ্ন কপালীটোলার জন্মেছিল এক কুক পরিবারে। খালি পায়ে ফ্রক পরে কপালীটো- বউবাজার বেন্টিক স্ট্রীটে খেলা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাটা ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। পাদরীদের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে এসপ্ল্যানেডেও হাজির হয়েছিল। সেখান থেকে ইডেন গার্ডেন—গঙ্গার ধার—কেল্লার আশেপাশে। তখন তার বয়স ষোল-সতের। কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কতজন টুপি খুলে ইঙ্গিতময় চোখে মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছে—গুড ইভ্নিং মিস—। কতজন! কেল্লার গোরার দল—তাদের আসতে দেখলে ও এবং ওর সঙ্গিনীরা পরস্পরের গা টিপে বলত—ইয়া, দে কাম্মিং দি বয়েজ! কত জেন্টিলম্যান। ওর প্রথম যৌবনকালে মটর ছিল না, ছিল ফিটন। ফিটনে যেতে যেতে—জেন্টিলম্যান মৃদু হেসে টুপি খুলে সম্মান দেখাত, ওরাও হেসে পরস্পরের দিকে চাইত; ফিটন থেমে যেত; জেন্টিলম্যান নেমে আসত; ফিটনে বেড়াবার হোটেলে খাবার নিমন্ত্রণ জানাত। আলোকোজ্জল হোটেল, স্বর্ণাভ পানীয় ভরা কাচের গেলাস, নরম গদীআঁটা চেয়ার, কার্পেটপাতা সরু মেঝে, দেওয়ালে দেওয়ালে আয়নায় আয়নায় প্রতিবিম্ব, যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান; তুষারশুভ্র দেহবর্ণ জেন্টিল-ম্যানের পাশে বসে কালো মেয়ে ভুলে যেত কপালীটোলার এঁদো গলি, মুর্গী-কুকুর অধ্যুষিত নোংরা উঠান, ময়লা বিছানার গন্ধ, ভাঙা দাগধরা কাচের বাসন, আরও অনেক কিছু। মনে

হত স্বর্গে এসেছে।

কপালীটোলা থেকে—এলিয়ট রোড, সেখান থেকে এণ্টালী, এণ্টালী থেকে বউবাজারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা সেরে এসেছে এখানে; এই চারতলার ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ কাঠের ঘরে। কেটির সঙ্গে বৎসর দুয়েক আগে আলাপ হয়েছে। পথে আলাপ, কেটির শরীর তখন খুব খারাপ, সবে বেরিয়েছে হাসপাতাল থেকে; আশ্রয় নাই, ঘুরে বেড়াচ্ছিল—ভাবছিল কোথায় যাবে। বুড়ী ম্যানার সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। তাকে দেখবা মাত্র ম্যাগী তার অবস্থা বুঝতে পারলে। সে তাকে ডেকে নিজের ওই ছোট কুঠুরীতেই স্থান দিয়েছিল। কিছুদিন সে-ই তাকে খাওয়ালে। এখন কেটি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, যৌবন তার এখন পরিপূর্ণ। বেশভূষায় যথেষ্ট খরচ করেও তার কিছু অর্থ বাঁচে। পূর্বের উপকারের কৃতজ্ঞতাবশেই কেটি এখন ম্যাগীর কাছে খায়। বন্ধুবান্ধব এলে ম্যাগী চা দেয়, কেক বা টোস্ট করে দেয়, আগে বরাত থাকলে মুর্গীর সুরুয়াও বানিয়ে দেয়। উদ্বৃত্ত খাবার থেকেই ম্যাগীর চলে যায়। এর জন্য যে টাকাটা কেটি তাকে দেয় সে তার বাঁচে, তার থেকে ঘরভাড়াটা দেয়, কেটির ঘরদোরও সে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে থাকে। তা বলে সে তার ঝি নয়, সেটা সে স্নেহবশেই করে। স্নেহবশে সে কেটিকে অনেক সদুপদেশ দিয়ে থাকে। সুস্থ শান্ত মুহূর্তে কেটির রুখু ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দন্তহীন মুখে স্নেহের হাসি হেসে বলে—কেটি মাই ডিয়ারি—ইউ নতী গাল—লিচেন মি। বে—লি ব্যাদ—দিছ লাইফ; নো হ্যাপিনেছ, নো পীছ! লুক মি, দিছ ওলদ্ আনহ্যাপি উয়োম্যান! লুক!

বলে—কেটি এ পথে শান্তি নেই রে, সুখ নেই আনন্দ নেই, নেই কিছু নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধা হতভাগিনী আমার দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। সমাজে সকলে ঘৃণা করে, এই বাবুরা বলে ম্যাগী—তার অর্থ বেশ্যা, বলে মাসী—তার অর্থ তরুণী বেশ্যা নিয়ে ব্যবসায়িনী বৃদ্ধা বেশ্যা। দুঃখ দেখ, আজ আমি তোর ঝিয়ের বৃত্তিই অবলম্বন করেছি একরকম। কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ।

নিজের সেই ঝলমলে ঘাঘরাটার প্রান্ত টেনে তাকে দেখিয়ে বলে—দার্তি র‍্যাগ! লুক!

কেটি কোন কথা বলে না, সে উপুড় হয়ে বুকে বালিশ রেখে শুদ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সামনের সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের পাশের মেহগনি গাছের সারির মাথার দিকে। কখনও কখনও চার্চের মাথায় ক্রশটার দিকে চায়।

ম্যাগী তাকে বলে—এর চেয়ে বিয়ে করে ঘর বাঁধ। তুইও রোজগার কর, স্বামীও রোজগার করুক। এই সেদিন আমার ছেলেবয়সের সই মেরী এসেছিল, এই শরীর তার, তেতলায় উঠে হাঁপিয়ে সারা; বেশ আছে, মুখে হাসি কত! তার কানে এই মস্ত দুটো সোনার বলইয়ারিং। হাতে দুগাছা করে চারগাছা সোনার চুড়ি। ফ্রকটা দেখলাম চমৎকার দামী ছিটের। সিল্ক সার্টিনের পোষাকও ওর আছে। তার ওলদ্ ম্যানকে কত বকলে আমার কাছে। ছেলে হয়েছে, তারা চাকরি করছে, মধ্যে মধ্যে কত জিনিস দেয়, টাকা দেয়; বউ হয়েছে, নাতি-নাতিনী হয়েছে। ছোট বউটা কাছে থাকে। তার বড় ছেলেটাকে নিয়ে বগলস-আঁটা খরম পায়ে—এই বড় ঝোলা হাতে রোজ সকালে বাজারে যায়, দুপুরে পশম

নিয়ে মাফলার পোয়েটার বোনে। বললে—অ্যানি, বোনার আর বিরাম নেই আমার। তবে দুপুরটা কাটে ভাল। রবিবারে সুন্দর পোষাক পরে সুন্দরী নাতনীগুলোকে নিয়ে চার্চে যায়। নাতনীরা বড় বড় হয়েছে, এই তো সামনের লরেটোতে পড়ে; বড়টি লরেটো সেরে নার্সিং শিখছে। মেজটি এবার শেষ করবে লরেটোর পড়া। তারপর সে শিখবে টাইপরাইটিং। কাজের তো অভাব নেই। টেলিফোন আপিসে চাকরি, রেলের বুকিং আপিসে চাকরি, এগুলো তো আমাদেরই জন্মে। রং যাদের কটা তারা অবশ্যি খাতির বেশী পায় কিন্তু চেষ্টা করলে তোকে যোগাড় করে দিতে পারি কিছু না কিছু। বলিস তো, আমি যাই সেন্ট জেভিয়ারের ফাদারের কাছে। বলি—ফাদার, বি ম্যাগ্নিফুল, তেক পিতি অন এ ফলেন গাল। রিপেনটেন্ত গাল! পুওোল ক্রিচাল। ইউ ত্রাই ফর হার। প্লিজ প্লিজ ফা-দার!

কেটি চুপ করে শুনতে শুনতে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, স্টপ—ইউ, ইউ উইচ আই সে, ইউ স্টপ!

—হোয়াত?—চমকে ওঠে ম্যাগী।

—ডেভিল যে টেক ইউ, ডোণ্ট ইউ হিয়ার? স্টপ, আই সে ইউ স্টপ, ইউ ওল্ড হ্যাগ, ন্যাস্টি ক্রীচার।

ম্যাগী ক্ষেপে যায়—হোয়াত?

কেটি উঠে চুলটায় বার কয়েক চিরুনি বুলিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে, হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে খট খট করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। রাত্রে ফেরে মত্ত অবস্থায়। কেউ সঙ্গী এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। রাত্রে ওর ঘুম ভাল হয় না। কেটি যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ঘুম আসেই না। একটা উদ্বেগ অনুভব করে। হয়তো থানায় ধরে নিয়ে গেছে। অথবা হয়তো কেটি জখম হয়েছে। কাল হাসপাতাল থেকে খবর আসবে। কিংবা হয়তো কেটির আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। মর্গে কয়েকদিন পচবে, তারপর যা হোক কোন পরিণতি লাভ করবে। হয়তো তার হাড়গুলো কোন ডোম কোন ছাত্রকে বিক্রী করে দেবে, সে টেবিলের উপর তার হাত অথবা পায়ের হাড় ঠুকবে আর পড়বে। কেটির আত্মা বেদনায় অঝোরঝরে কাঁদবে। বুড়ো বয়সে ম্যাগী তার শক্তির সঙ্গে জীবনের সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে! মহানগরীর জীবন অবিরল মথিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের শাসনত্রস্ত প্রবৃত্তি গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে সকল গতিকে পিছন দিক থেকে টানছে। দুই আকর্ষণে মথিত হচ্ছে জীবন, মহানগরীর জীবন। অমৃত উঠছে, বিষ উঠছে। সেই বিষে জর্জরিত হয়ে ম্যাগী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই চারতলার কাঠের কুঠরীর কোণে। কেটি ছুটে যায় ওই বিষের প্রলোভনে। তাই তার কেটির জন্ম এত উৎকণ্ঠা। তাই কেটি এত গালাগালি দেওয়া সত্ত্বেও, সে ফিরে এলেই ম্যাগী সন্তর্পণে উঠে তাকে দেখে আবার শোয়। সে মত্ত হয়ে ফিরে এলে ম্যাগী বেরিয়ে আসে নিজের ঘর খুলে, কেটির ঘর খুলে তার সঙ্গীর সাহায্যে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সঙ্গীটাকে বিদায় করে দেয়। কেটিকে প্রাণভরে গাল দেয়, মাথায় জল দেয়, বাতাস করে, সময়ে সময়ে এই সুযোগে সে তাকে দু'চারটে চড় কষিয়েও দেয়। আবার সকালে কেটি উঠলেই তার ঘরে উঁকি মেরে বলে—ফিলিং ওয়েল?

কেটি একটু হাসে। ম্যাগী বলে—ওয়াশ ইওর হেড, ফেস। আন্দাস্তান্দ ?

একটু পরেই চা রুটি এনে সামনে রেখে পাশে বসে। বলে—বেলী গুড হেলথ ! ভ্যাতস গুড। নাউ তেক ত্তি।

বিমল উঠল। চা খাবার সময় হয়েছে। মেসে চায়ের ব্যবস্থা নাই। দোকানে গিয়ে সকলে খেয়ে আসে। সমৃদ্ধ অবস্থার বাবুদের মেসের বাবুরাও দোকানে যায়। চায়ের ব্যবস্থা রাখলে আপিসের ভাত হয় না। তাছাড়া মোড়ের মাথায় একটি ভাল চায়ের দোকান আছে, যার আকর্ষণই হল সব চেয়ে বড়। চা থেকে খাবারদাবার চমৎকার তৈরী করে ওরা। পরিচ্ছন্নতাও প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ সমারোহের নেশা, নগরজীবনের এটা একটা বিলাস। যারা রেস্তোরাঁয় ঢোকে নি তাদের প্রথম ঢুকতে বাধ-বাধ ঠেকে। ঢুকলেই আর রক্ষা নাই। সে তাকে টানবেই।

এ মেসের বাবুরা সাধারণত ও রেস্তোরাঁয় যায় না। যায় পাশের একটা রেস্তোরাঁয়। সেটার জমজমাট কম। খাবার-দাবারের দামও কিছু কম। চপ কাটলেটে দু পয়সা, কারির ডিস দু আনা, মটনচপ ব্রেস্ট কাটলেট বড় কেউ একটা খায় না—তা হলেও তার দামও কিছু কম। এ ছাড়া ওখানে ঢুকে এ মেসের বাবুরা মনে মনে একটা জটিলতার পাকে পাক খেতে থাকে যেন ; ঘন ঘন চারিপাশের টেবিলে তাকায়, টেবিলের অধিকারীদের সাজসজ্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, স্যুট, রকমারি চশমা, কারও মুখে চুরুট, কারও মুখে সিগারেট, এ সব দেখে নিজেদের লংক্লথের ইস্ত্রি, লাটখাওয়া পাঞ্জাবি ও সাবান-কাচা কাপড়ের দিকে চেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি ভোগ করে, চা খেয়ে বিড়ি ধরাতে লজ্জা পায়। তাই তারা পাশেরটায় গিয়ে বসে। বিমল দুটোতেই যাবে অবশ্য। যেদিন যেটার উপযুক্ত সামর্থ্য তার পকেটে থাকবে, সেদিন সেটাতে গিয়ে ঢুকবে।

একবার মনে হল বুড়ী ম্যাগীর সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাটা করে নিলে মন্দ হয় না। তেতলা সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া আসা, কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটা, অনেক সময় সাপেক্ষ। পর-মুহূর্তে মনে হল—না, একান্ত বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে যতটুকু জড়িয়ে না পড়ে উপায় নেই তার চেয়ে জড়ানো ঠিক হবে না। বুড়ী ম্যাগীও আশ্চর্য, পূর্ণ এক টিপট চা তার নষ্টই হল কিন্তু বিমলকে বললে না—এক কাপ তুমি খাও।

চা খেয়ে খানিকটা ঘুরে সে ফিরল। পাড়াটাকে চিনে নিতে চেষ্টা করলে। বেন্টিক স্ট্রীট লালবাজার থেকে সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু পর্যন্ত প্রাচীন বউবাজার এখনও টিঁকে আছে। নানা জাতের সংমিশ্রণ এখানে, অভারতীয় অনেক, অবাঙালী প্রায় সবাই। বউবাজার স্ট্রীটের দুই পাশে অসংখ্য সরু গলি এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। এগুলি যত সংকীর্ণ তেমনি অপরিচ্ছন্ন, তেমনি জীর্ণ, তেমনি বিপদসঙ্কুল। উর্দুভাষাভাষী মুসলমান, ম্যাগী-কেটির গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী, চীনেম্যান, জু, ইয়োরোপের আরও অনেক দেশের অধিবাসী দুজন একজনকে এ অঞ্চলে খুঁজলে পাওয়া যায়। পাড়ার বাড়ীগুলি অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীতে ঊনবিংশ শতাব্দী যেন এই প্রাচীন অঞ্চলটার জীর্ণ ইট-কাঠ-পাথরে

জড়িয়ে পড়ে আছে। এখানকার মানুষগুলির অধিকাংশেরও ওই অবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলো নিভে গিয়েছে, বিংশ শতাব্দীর আলো—তার কল্যাণস্পর্শ যেটুকু, তা পায় নি—তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারকে আশ্রয় করে রাত্রির মানুষের মত জীবনযাপন করে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ গড়তে চেয়েছিল যে কলকাতা, তারই জীর্ণ টুকরো। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্র স্থাপন করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, সে স্থাপন করতে চেয়েছিল ধর্মে সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ইংরেজের একান্ত অনুগত মানুষের বসতি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বউবাজারে চার-চারটে গির্জা। গির্জার সঙ্গে কৃশ্চান এবং ফিরিঙ্গীদের জন্যে ইস্কুল। সে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে দীক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; ইংরিজী ভাষায় শিক্ষিত করে শিক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; আপিসে, ডকে, রেলওয়েতে, কলকারখানায় তাদের চাকরি দিয়ে তাদের প্রভু হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভু হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভু; এদের দুর্দান্তপনা শিখিয়ে পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল এবং এদের দিয়েই বাঙালীকে, বাঙালীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে দমন করেতে চেয়েছিল, দাস করতে চেয়েছিল।

কাঁসরঘণ্টা বাজছে। ফিরবার পথে থমকে দাঁড়াল বিমল।

ফিরিঙ্গী কালীর বাড়ীতে আরতি হচ্ছে। মাটির কালীমূর্তির সামনে প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি হচ্ছে। কয়েকটি বুড়ো-বুড়ী ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জী, মাথায় হ্যাট। আরতির শেষে বুড়ো-বুড়ীরা চলে গেল, একজন বুড়ী একটা পয়সা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মনে মনে বিড় বিড় করে কিছু বলে তবে গেল। ছেলেগুলো এখনও ঘুরঘুর করছে। এক এক টুকরো মিষ্টান্ন প্রসাদের জন্য বোধ হয়। ফিরিঙ্গীকালী, বিচিত্র নাম, হিন্দুদের উচ্চস্তরের লোকেরা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা প্রণামও করে না। কিন্তু তারা জানে না—ফিরিঙ্গীকালী আসলে গির্জের দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের রক্ষাকালীর মত যুদ্ধ করে এসেছে।

সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ের মোড়ে এসে দাঁড়াল বিমল। মহানগরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কারের কল্যাণে সভ্যতার মধ্যে গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল দাবীতে প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মসৃণ পথ চলে গিয়েছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অভিমুখে।

আশ্চর্য! ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরীর অংশটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা সঙ্কুচিত হয়ে পিছনে হটে গিয়েছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দু পাশের স্থান অধিকার করে বড় বড় প্রাসাদ গড়ে তুলেছে মাড়োয়ারী ··রা। ওপাশে এগিয়ে এসেছে বাঙালী উচ্চ-বিত্তেরা, সচ্ছল মধ্যবিত্তেরা। ইংরেজ ধনীর স্থলে ভারতীয় অবাঙালী ধনীরা জয়লাভ করেছে। বাঙালীর স্থান অধিকার করেছে।

পথে আরও একটি কালীবাড়ী। সেখানেও আরতি হচ্ছে। সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের ঠিক সামনেই। চার্চের অঙ্গীভূত সেণ্ট জোসেফ স্কুলের কোথাও ছেলেমেয়েরা কোরাসে গান গাইছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। চীনে-সাহেবরা দোকানে বসে লম্বা পাইপে ধূমপান করছে আরাম করে। এই এক জাত। এদের বোধ হয় কেউ হটাতে পারবে না। ধনশক্তি, সৈন্যশক্তি নিয়ে ওরা আসে নি, ধর্ম প্রচার করতে আসে

নি, চীনা সংস্কৃতি বিস্তার করতে আসে নি, এসেছে নিজেদের শ্রমশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য নিয়ে; কারও সঙ্গে তাই মানসিক দ্বন্দ্ব নাই, কেউ ওদের শত্রু বলে গ্রহণ করে নি, মিত্র বলেও সমাদর করে স্থান দেয় নি, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ওরা নিজেদের স্থান দখল করেছে। দখল করার মধ্যে দ্বন্দ্ব করে নাই, যে স্থানটা শূন্য হয়েছে সেই স্থানটা পূর্ণ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু ফিরিঙ্গী এবং অপ-ম্রিয়মাণ অপর সম্প্রদায়ের স্থান পূর্ণ করে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বউবাজার পর্যন্ত নিজেদের প্রসারিত করেছে। মহানগরীর জীবনে ওদের কর্মনৈপুণ্যের শ্রমশক্তির স্থান অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বকর্মা এ পুরীর অন্যতম দেবতা, ওরা তাঁর অনুচর। সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের পিছনে এমনি আর একটি সম্প্রদায় বস্তীর অন্ধকারে কেরোসিনের ডিবে জেলে কলরব করছে। ওড়িয়া শ্রমিকেরা।

বিচিত্র উপলব্ধি নিয়ে সে আপন ঘরে ফিরল।

মেসগুলি তখন গুলজার হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বাবু মেসের সভ্যেরা ফিরছে খেলার মাঠ থেকে, চাঙোয়া থেকে, সিনেমা থেকে, এসপ্ল্যানেড থেকে। এ মেসের বাবুরা ফিরছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা শুনে, গোলদীঘির চারিপাশে পাক দিয়ে, হাড়কাটা গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বারকয়েক টহল দিয়ে।

জনকয়েক ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখবার মত দৃশ্য বটে। চারতলার উপর থেকে রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে বিচিত্র। মধ্যালোকে আলোর সারি। তার অপর্যাপ্ত আলোকে অস্পষ্ট রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা দীর্ঘ সরল গহ্বর পথের মত, দ্রুত সঞ্চরমাণ মটরের হেডলাইট ছুটে আসছে—বেঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে; যেন পাতালপুরীতে ছুটোছুটি করছে হাজার আলেয়া।

এখানে এসে এক অদ্ভুত সত্যকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাটাই সে ভাবছে। কলকাতায় ইংরেজ হেরে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অংশটা প্রত্যক্ষ—তা ছাড়া আরও একটা যুদ্ধ চলে আসছে কতকাল ধরে। ইংরেজ সেখানে হারছে। ইংরেজ এই পাড়াটার উত্তর সীমানায় সেকালে একটা কেল্লা গড়েছিল। ইস্কুল তৈরী করেছিল, অনুগত দাস তৈরী করবার কার-খানা করেছিল। সে কারখানায় তারা বেদখল হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে। সেটা সবারই চোখে পড়েছে। কিন্তু সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু বউবাজারের মোড়ে সে দেখে এসেছে তারা কতটা পিছিয়েছে। কথাটা সে গোপেনদাকে বলবে। মিহিরকে বলবে।

পরদিন সকালে উঠে সে এই কথাটাই লিখতে বসল।

বাইরে থেকে কে বললে—মে আই কাম ইন?

বিমল চোখ তুলে চাইলে; কেটি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বললে—কাম ইন। ইজি-চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললে—টেক ইওর সীট প্লীজ!

কেটি বললে—আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ।

—ইয়েস, আই স্যাল বি—

—নো। আই নো, ইউ আর নট প্লিজড। আই নো।

সে বসল চেয়ারে।

বুড়ী ম্যাগী—এসে মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—গুড মর্ণিং মাই সন্। তারপরেই সবিস্ময়ে বললে—কেটি হিয়া? গ্যাড! দোস্ত কোয়াল—কেটি—দোস্ত—!

কেটি বিরক্ত হল। বুড়ী বললে—বি ফ্রেন্দ। তারপর বললে—তি? তু কাপস অব তি? এঁ! একমুখ হেসে সে চলে গেল।

ম্যাগী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ইউ লীভ্ দিস প্লেস।

বিমল তার দিকে তাকালে। কেটির কপাল কুঞ্চিত, চোখের কোণে একটা বিরূপতার ছাপ।

—হোয়াই? বিমল স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে।

—ইফ ইউ স্টে—নো ফ্রেণ্ডস্ কাম্ হিয়ার—ইউ লীভ!

—না। বিমলের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ দৃঢ়তর হয়ে উঠল। কেটি নিষ্ফল আক্রোশে নিজের ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরলে। কণ্ঠা ফুলে উঠেছে। চোখের দু'পাশে অসহায় ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে। বিমল অনুভব করলে, সে থাকলে কেটির ব্যবসায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। নিশ্চয় রতু আর মণ্টবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছে, বিমল থাকলে তারা আর আসবে না। বিমলকে এ মেস ছাড়তে হবে, নইলে তারা অন্যত্র যাবে।

কেটি অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলে—ইফ্ ইউ ডোণ্ট গো, আই শ্যাল কীল ইউ!

বিমল স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে—ডোণ্ট শাউট্।

তার চীৎকারে ম্যাগী ছুটে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দন্তহীন মুখব্যাদান করে প্রাণপণে সন্ধির প্রস্তাব করে—দোস্ত কোয়াল—ফ্রেনদ—তি হিয়া—তেক—।

এক ধাক্কায় কেটি চায়ের পেয়ালা দুটো ফেলে দেয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাপ দুটি। ঘরময় গড়িয়ে পড়ে সদ্য তৈরী করা গরম চা।

—আই উইল কল হামফ্রে, হী উইল স্ট্যাব্ হীম—হী উইল কীল হীম। কেটির কণ্ঠস্বর সপ্তম স্বরে উঠে যায়।

বিমল ভর্ৎসনার সুরে বলে, ডোণ্ট শাউট—গো নাউ।

ম্যাগী মাঝখানে এসে উভয়ের বন্ধুত্বের সেতু গড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু কেটি তার হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে, লেখার কাগজপত্র ওলটপালট করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে—ম্যাগী তার পিছন পিছন গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে—দোস্ত কাই মাই গাল—দোস্ত কাই।

বিমল নিঃশব্দে লেখার কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল।

—কি ব্যাপার বিমলবাবু?

বিমল মুখ তুলে দেখলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেসের ম্যানেজার দুলু বোস। বিমলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

## ষোল

খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়ে কেটি। ধর্মে কৃশ্চান অথচ খাঁটি বাঙালী, বিমলের অজানা নয়। এঁদের অনেককে জানে। এঁদের দু'তিনজন তরুণ সাহিত্যিককেও সে জানে। নিজের দেশেও সে এঁদের দেখেছে। সেই ঘরের মেয়ে? কেটির নাম কেতকী? সে বি-এ পর্যন্ত পড়েছে? শিক্ষিতা মেয়ে? তার এই পরিণতি? বিমলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অবিশ্বাস করবারও উপায় ছিল না। শেষ কয়েকটি কথা কেটি খাঁটি বাঙলায় বিশুদ্ধ বাঙালী উচ্চারণে বলে গেল।—বোস থামতেই সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—তারপর?

—তারপর? একটু দুঃখের হাসি হাসলেন বোস। সে হাসিটুকু তাঁর মুখে লেগেই রইল, বললেন—তারপর কেতকী থেকে হল কেটি, শাড়ী ব্লাউজ ছেড়ে ফ্রক-গাউন পরলে, চুলের লম্বা বেণী কেটে ফেলে বব করলে, কপালে কুমকুমের টিপ ছেড়ে লিপস্টিক রুজ ধরলে। ধাক্কা খেতে খেতে এখানে এল, নিয়ে এল ওই ম্যাগী। ম্যাগী অবশ্য ওর আসল পরিচয় জানে না, সে ওকে নিজেদের জ্ঞাতিগোত্রই মনে করে। কেটি ওদিক দিয়ে পাকা অভিনেত্রী, আজও এক আমার কাছে ছাড়া বউবাজার অঞ্চলে আর কারও কাছে ধরা পড়েনি।

বিমল প্রশ্ন করে বসলে—আপনি ওকে ধরলেন কি করে? প্রশ্ন করেই সে লজ্জিত হল। বললে—মাফ করবেন আমাকে—প্রশ্নটা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

বোস হেসে উঠলেন। বললেন—কিছু অন্যায় হয় নি। যতটা বলেছি তাতে যে কেউ হোক এ প্রশ্ন করতই। প্রশ্নটা এড়াতে গেলে কথাটা পাড়াই উচিত নয়। এ কথা গোপেনদা, মিহিরবাবু জানেন। আর আপনাকে বলছি। একসময় সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা পুলিশের স্পাই। আমাদের মেসটার সঙ্গে গোপেনদার সংস্রব সন্দেহ করে তারাই একে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের মেসটার বিচিত্র ধারা-ধরণের কথা জানেন তো!

বিমল ঘাড় নেড়ে জানালে—সে জানে।

বোস বললেন—আমার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার পরিচয়টা বলি শুনুন। পয়সাওলা বাপের ছেলে, আমার নাম দিলীপ বোস, ছেলেবয়সে সকলে ভাল ছেলেই বলত। স্বাস্থ্য দেখছেন তো, এমনি স্বাস্থ্য আমার ছেলেবয়েস থেকেই; তার উপর দুর্দান্ত মারহাত্যা আর ফুটবল ক্রিকেট হকিতে ভাল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলাম। পড়াশুনাতেও কোনবার ফেল করি নি। কাজেই গোপেনদাদের দল আমার উপর হাত দিলে। আমারও তরুণ বয়স, আমিও ঝুঁকে পড়লাম। তারপর কলকাতায় কলেজে এলাম। তিরিশ সালে জেলও ঘুরে এলাম। তারপর বছর খানেক ডিটেনশন। সেখান থেকে আবার কলেজ। গোপেনদারা তখনও ডিটেনশনে। কলেজে ঢুকে, মানে ল কলেজে, খেলায় মাতলাম। বাস, কেরিয়ার খুলে গেল। কলেজের টিম থেকে নামজাদা বড় টিমে ঢুকে গেলাম। আমার সেণ্টার-হাফের খেলা দেখে ছেলেরা হিরো বানিয়ে ফেললে, মেয়েরা প্রেমে পড়ে গেল, দিলীপ বোস থেকে নাম হয়ে গেল দুলু বোস।

—আপনিই খেলোয়াড় ডুলু বোস ?

হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বোস বললেন—আপনি মশাই নেহাৎ গোঠছাড়া সাহিত্যিক। সাহিত্যিকদের খেলা দেখার বাতিক বিখ্যাত। খেলার মাঠে বেলা ছুটো থেকে তাঁরা বসে থাকেন, এখনও থাকেন বোধ হয়। সাহিত্যিকদের কাছে আমার পরিচয় দিতে হয় না। দেখলেই তাঁরা আমাকে চিনতে পারেন।

বিমল লজ্জিত হল, বললে,—খেলা আমি বড় দেখি না, কিন্তু তবু আপনাকে চেনা উচিত ছিল আমার। আপনার ছবি অনেকবার দেখেছি।

—ছবি ? হো-হো করে হেসে উঠল ডুলু বোস। ছবি দেখে না চেনার জন্যে নিশ্চয় আপনার অপরাধ নেই। ছবি যারা তোলে তারা আমাকে এমন সুপুরুষ বানিয়ে তোলে যে সে ছবি দেখে আসল আমাকে চেনাই যায় না।

বিমলও হেসে ফেললে।

ম্যাগী উঁকি মারলে এবার—মিস্তার বোস।

বোস মুহূর্তে পাল্টে গেলেন—ভুরু কুঁচকে বাংলাতেই বললেন—কি ?

—ওয়ান ওয়াদ। ওনলি ওয়ান ওয়াদ। প্লিজ।

বোস তাকে ধমকালেন, বললেন—বাংলা, বাংলাতে বলো ম্যাগী।

ম্যাগী ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে মিনতিভরে বললে—কেটির পর বহত গোসা আপনি করবেন না বোসবাবু। আনফরচুনেত গাল।

—হ্যাঁ, হতভাগী। সে তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকের ও কেলেঙ্কারিটা তুমি বাধালে কেন। ঝগড়ার জন্য তুমিও দায়ী।

—কয় দিস—মুকুর্জী, বোসবাবু, মুকুর্জীবাবুর লিয়ে। মুকুর্জী হামকে বললো মামী। আপ্না বেটার মতুন ভালবাসলো আমি। বোসবাবু, কেটি মুকুর্জীকে উপর খোসা করল। কাল রাতে মাতোয়ারা হয়ে আসলো, বহত গাল দিলো মুকুর্জীকে। হামকে বললো হামক্রেকে ডাকবে। আজ সকালে উ নিজুসে আসলো মুকুর্জীর ঘর। আই থট বোসবাবু—দিস ইজ জাস্ট দি টাইম, কেটির সাথ মুকুর্জীর দোস্তি লাগাইয়ে দি। বাট্। হতাশ ভাবে সে ঘাড় নাড়লে। সি ইজ তেরিবল। আই কুদ নত রেজিস্ত মাইসেফ্। স্যাডস মাই ফল্ত। মাই ফল্ত বোস, দোণ্ট গেত অ্যাংরি উইথ পুয়োর কেটি।

বোস হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা। কেটিকে কিছু বলব না, তুমি যাও।

—প্লিজ, বোসবাবু, প্লিজ! ম্যাগীর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, আবারও সে মিনতি করলে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি ম্যাগী। তুমি জান আমি কথার খেলাপ করি না। যাও। তুমি এখন যাও।

দন্তহীন মুখে তোষামোদের হাসি হেসে ম্যাগী বললে—আই নো, আই নো স্যাড বোসবাবু। ইউ আ এ ম্যান অব ওয়ার্দ। এ ম্যান উইথ এ বিগ হাত, আই নো। চলে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল, বললে—তি ?

—না না। তুমি যাও এখন ম্যাগী। দেখছ না কথা বলছি আমরা।

ম্যাগী চলে গেল। বোস বললেন—শরীরের জাতও নেই, ধর্মও নেই বিমলবাবু। ও যখন বলছিল—কেটির সঙ্গে মুখার্জির ভাব করিয়ে দি, তখন আমার মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের মোক্ষদা ঝিয়ের কথা। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে এর তফাৎ কোথায় বলুন তো! যদি ভাব হত আপনার সঙ্গে কেটির—তবে দেখতেন ও মদ খেতে চাইত, এবং মদ খেয়ে চীৎকার করত যে মুকুজ্জির কাছে কেটির আন্টি হিসেবে টাকা আদায় করে তবে মদ মুখে তুলেছি। কোন তফাৎ নেই।

বিমল বললে—ম্যাগী কিন্তু কেটিকে সত্যিই ভালবাসে।

—তা বোধ হয় বাসে।

—বোধ হয়? সন্দেহ করেন আপনি!

—খানিকটা।

—কেন বলুন তো!

—কেন! হাসলেন বোস। বললেন—কেটির দৌলতে আজ ওর ভাত জুটছে বিমলবাবু। কেটির নাগরদের কাছে টিপসই হল ওর প্রধান উপার্জন। কেটি ওর কাছে খায়—লোকজন এলে চা কেক রুটি দেয়—তার থেকেই ওর আহার সংস্থান হয়। কাজেই কেটিকে ভালবাসার কতখানি ওর প্রয়োজনের খাতিরে, কতখানি অকৃত্রিম এ কথা বলা শক্ত।

বিমল হেসে বললে—প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ মানুষের কাছে আসে দিলীপবাবু, তারপর প্রয়োজনের মেলামেশার মধ্যেই ভালবাসার সুরু হয়।

—অস্বীকার করি না। কয়লার মধ্যে শুনেছি হীরে পাওয়া যায়। কয়লাই কোন যাদুতে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় হীরেতে পরিণত হয়। কিন্তু সে কদাচিৎ। আমার অভিজ্ঞতা অনেক। যাক ওসব কথা। এখন যা বলছিলাম। কি বলছিলাম! হ্যাঁ, কেটির কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলছিলাম। বলার খানিকটা দরকার আছে।

দিলীপ বোস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—দিলীপ বোস দুলু বোস হয়ে গেল বিমলবাবু। খেলার পিছল মাঠে দৌড়ুতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। খেলায় স্লিপ জানেন তো, পড়ে তেমনি ভাবে পিছলে একবারে এসে খানায় পড়ে গেলাম বিমলবাবু। এমন বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম সে অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুলু বোস বললে—সব হারালে সব পাওয়া যায় বিমলবাবু—চরিত্র হারালে আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। যারা দু'চারজন পায় তারা অসাধারণ। গোপেনদার মত এমন ব্যক্তিত্ব এমন চরিত্র—তিনি ডিটেনশন থেকে ফিরে এসে আমায় শোধরাবার জন্যে অনেক করলেন—কিন্তু। হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লে দুলু বোস—গোপেনদার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, দুলু বোস তার নিষ্কলুষ আত্মাকে ফিরে পায় নি।

—তবে এই কলুষ কাজে লাগল অন্তদিকে। ল কলেজে পড়লাম বছর পাঁচেক—পরীক্ষা অবশ্য দিলুম না। তারপর আরম্ভ করলাম ব্যবসা। দালালী। এই কদভ্যাসগুলো মূলধনে দাঁড়াল। এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—মা লক্ষ্মী এই অনাচার সহ্য

করেন কি করে। অথচ প্রায় গোটা ব্যবসার ক্ষেত্রটাই যেন এই অনাচারের ইঙ্গিতে চলছে। ধরুন—নতুন কণ্ট্রাক্ট পেতে হবে, আপিসের বড় সায়েবকে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে আপ্যায়িত করতে হবে। পানীয় না হলে পার্টি হয় না, তার সঙ্গে প্রচারনৃত্য দেখতে হয়।

হাসলে হুলু বোস।

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে সংসারী হবার চেষ্টা করেন না কেন দিলীপবাবু?

নিভে-যাওয়া সিগারটা আবার ধরিয়ে হুলু বোস উপরের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বোধ হয় ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে—সংসারে কোন মেয়েকে দু দিনের বেশী তিন দিন ভালবাসতে পারি না বিমলবাবু। প্রথম দিন নেশা ধরায়, তারপর দিন সে নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠি, দুদিন তাকে ভালবাসার ভানে ভোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে সে নেশার একবিন্দু আর অবশিষ্ট থাকে না। নিজের উপরেও ঘৃণা জন্মে যায় দিন কয়েকের জন্যে, সে কয়েক দিন কৃচ্ছ্রসাধন করি, তারপর আবার মেতে উঠি নূতনের নেশায়।

বিমল বললে—এ সম্ভবত এক ধরণের ব্যাধি।

—তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই বিমলবাবু। যাক্—তারপর শুনুন। গোপেনদা হাল ছেড়ে দিলেন। আমি নিজেই গোপেনদাকে বললাম—আমার উপর আর পণ্ডশ্রম করবেন না। তবু গোপেনদা সম্পর্ক ছাড়লেন না। এই মেস করে দিলেন। বললেন—একটা উপকার হবে আমার। কারও গা-ঢাকা দিয়ে থাকার দরকার হলে—নিরাপদেই থাকতে পারবে। সামনে বাইজীরা থাকে, মেসের বাসিন্দারা রীতিমত বাবু লোক, মালিক হুলু বোস—চট করে নজর কারও পড়বে না। এখানকার বিখ্যাত গুণ্ডারা খেলোয়াড় হুলু বোসকে জানে—তার গায়ের শক্তি, ঘুষির জোরের কথাও জানে, টাকাপয়সার ব্যাপারে দিলদরিয়া মেজাজের কথাও জানে, ভালবাসে, ভক্তি করে, ভয় করে; কাজেই তারা আমাকে জানায় কে কোথায় উঁকিঝুঁকি মারছে। এই অবস্থায় এক দিন ম্যাগী নিয়ে এল কেটিকে। রোগা-কালো মেয়েটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করি নি। কিছুদিন যেতেই মেয়েটা স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আমাদের সচকিত করে তুললে। মিহিরবাবু এখানে আসেন যান—তিনি প্রথম বললেন—দিলীপবাবু এ ফিরিঙ্গী মেয়েটা তো সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। আমার পিছনে ঘুরছে। সেইদিন সন্ধ্যের সময় আমি চৌরঙ্গীতে একটা হোটেলে ঢুকছি—দেখলাম মেয়েটা হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—লক্ষ্য করছে আমি। মিহিরের কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্দেহ হল, মেয়েটা বোধ হয় পুলিশের স্পাই। মিহির আসে, যাসে অবশ্য বাড়ীওয়ালার বন্ধুপুত্র হিসেবে, ঘরভাড়া দেওয়া-নেওয়ার অজুহাত নিয়ে। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ। হুলু বোস আজকাল প্রতিটি সন্ধ্যা হোটেলে গেলাস রেখে বসে থাকে, ট্যাক্সীতে তাকে তরুণী সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু একদিন সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল। পুলিশের সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। মেয়েটা ফিরিঙ্গী, ঘুরছে মিহির এবং আমার পিছনে, কাজেই ওই কথাটাই মনে হল। হোটেলে ঢুকলাম, কেটিও ঢুকল। সারাক্ষণ আমাকেই লক্ষ্য করলে। আমি উঠলাম, ও-ও উঠল, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সীতে উঠছি, কেটি পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে—

আমার একটু সঙ্গে নেবে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে কঠিন ভাবেই বললাম—কেন বল তো? ও বললে—আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না? আমরা একই বাড়ীতে থাকি। আমায় সঙ্গে নিলে একসঙ্গেই বাড়ী ফিরতে পারব। উপেক্ষা করেই চলে এলাম। ট্যাক্সীটা ছাড়ছে সেই সময় ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ জ্বলছে। এসে জগুকে বললাম, জগু-গুণ্ডাকে চেনেন তো? এখানে কালীতলায় সিঁদুরের টীপ পরে বসে থাকে। সে আর করিম—এরা দুজন হল এ অঞ্চলটির মালিক। ওদের বললাম—ওর পিছনে থেকে খবর নিতে। খবর জগুরা দিতে পারলে না—দিলে কেটি নিজেই। কয়েকদিন পর একদিন রাত্রে—ম্যাগীর চীৎকার আর হুটোপুটি শব্দ শুনে ছুটলাম ছাদে, দেখলাম একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কেটিকে নির্মম ভাবে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে। আমি তাকে ধরলাম, সে আমাকে আক্রমণ করলে—লোকটা শক্তিমান কিন্তু মাতাল, আমি শক্তিতেও তার চেয়ে কম ছিলাম না—তার উপর সেদিন পানীয় পান করেছিলাম মাত্রা রেখে। লোকটা কয়েক মিনিট পরেই শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ভাল করে দেখলাম লোকটাকে, চেনা লোক, ফুটবলের মাঠে হামফ্রেও নাম-করা হাফব্যাক। মারামারিতে সিদ্ধহস্ত। আমার সঙ্গে মাঠে দু'দশবার শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেছে; হামফ্রেও আমাকে চিনলে। বললে—বোস তুমি? তুমি এখানে? সে মার্জনা চেয়ে নেমে চলে গেল। আমি নীচে নামতে যাচ্ছি কেটি এসে আমার হাত ধরলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু মায়া হল বিমলবাবু। ঘরে এসে বসলাম। মেয়েটা হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বললে—বোস, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি বাংলা এত ভাল বলতে পার?

কেটি বললে—আমি কেটি নই বোস—আমি কেতকী। আমি কৃশ্চান কিন্তু ফিরিঙ্গী নই। আমি বাঙালীর মেয়ে।

## সতের

জুলু বোস কাঠের দেওয়ালের ছোট জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—সে দিন ছিল শরৎকালের জ্যোৎস্নার রাত্রি। কেটি বললে—বোস, তুমি পাঁচ মিনিট বস। ম্যাগীর ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে সে ফিরল—একেবারে বাঙালী মেয়ের পোষাকে। সাদা ব্লাউজ সাদা মিলের শাড়ী, পায়ে স্লিপার, কপালে কুমকুমের টিপ, মাথার চুলটা অবশ্য বব করা কিন্তু তাতেও সামনের দিকটায় নিখুঁত বাঙালী ছাঁদ। বললে—দেখ তো বোস আমি কেতকী কিনা?

চোখে আমার নেশা ধরে গেল। সাদা শাড়ীর বেষ্টনীর মধ্যে শ্যামলা রঙের চিরকেলে মিষ্টি বাঙালী মেয়ে।

কেটির সঙ্গে সে অভিসারের রাত্রি আমার চিরদিন মনে থাকবে। হুড খোলা ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডায়মণ্ডহারবারে একটা দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে ওকে

বললাম—কেতকী তুমি এমন হলে কেন ?

কেতকী বললে—আমার পোড়াকপাল বোস—আমি হতভাগী !

সম্ভ্রান্ত দেশী কৃশ্চান ঘরের মেয়ে। বাপ একটা বিলাতী ফার্মের একজন ছোট সাহেব। কেতকী তখন বি-এ পড়ছে। কুমকুমের টিপ পরে বেণী ঝুলিয়েই কলেজে যায়। কলেজের সভা-সমিতির পাণ্ডা। সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে। গান গায়। নিজেই ও নিজেদের কয়েকজন অন্তরঙ্গের মধ্যে আইন করেছিল—বাংলা কথা বলবার সময় যে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করবে—তাকে প্রতি শব্দের জন্ত এক পয়সা জরিমানা দিতে হবে। সেই সময় হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। ওদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে এলেন ছোটলাট-মহিষী। সেপাই এল, সান্ত্রী এল, তাদের সঙ্গে এল একজন তরুণ ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী। আই-পি। লাটসাহেবের মেম যাবেন—দুধারে পাহারা পড়েছে, পরিষ্কার পথ, সেই পথে একটি মেয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢুকে কোন কাজে যাচ্ছিল। ছোকরা সাহেব—তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে। মুহূর্তে কেতকী এসে তার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলে। একে বৃটিশ সিংহশাবক—তার উপর বৃটিশ ভারতের আই-পি, টেগার্টের উত্তরাধিকারী—সে কালো মেয়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করবে কেন ? সে ধাক্কাও দিলে টেনে সরিয়ে। কেতকী চীৎকার করে বললে—এ অপমানের প্রতিবাদে আমরা এ সভা ছেড়ে চলে যাব। এস, সব বেরিয়ে এস। বেরিয়ে কেউ গেল না। কালটা তখন মেয়েদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হতে সুরু করেছে। বীণা দাস কনভোকেশনে গুলী ছুঁড়েছে। প্রীতিলতা—চাটগাঁয়ে গুলী খেয়ে মরেছে. মেয়েদের জন্তে জেলখানায় পলিটিক্যাল ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েও সকলে মাথা হেঁট করে যে যার জায়গায় বসে রইল ; তাদের চোখের উপর সাদা পোষাকে বাঙালী আই-বি বাবু নাম টুকবার জন্তে খাতা পেন্সিল বের করেছে—একা কেতকীই বেরিয়ে এল।

কেতকীর বাপ চটলেন। বললেন—আমরা কৃশ্চান সমাজ নিরপেক্ষ রয়েছি। না থেকে আমাদের উপায় নেই। তুমি এ কি করে এলে ?

কেতকী বললে—এই অপমান সইতে হবে ?

—নিশ্চয় না। তার প্রতিকার হত। আমরা সভা করে এর প্রতিবাদ করতাম।

কেতকী এ কথার কোন উত্তরই দিলে না। বাপের দিকে একবার বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল রাস্তার দিকের বারান্দায়। বাপ পিছনে পিছনে এসে বললেন —তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আই-বি আপিসে। ডি-আই-জির কাছে নিয়ে যাব। আমাদের বড়সাহেব একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। এ্যাপলজি চাইতে হবে তোমাকে।

কেতকী বললে—না।

—না ? জানো এর ফল কি হবে ?

কি ফল হবে সে কল্পনা করতে হল না ; ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই একখানা মোটর এসে দাঁড়াল ওদের বাড়ীর সামনে। সেই মোটর থেকে নামল সেই তরুণ বৃটিশ সিংহশিশু।

বাপ ব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন। কেতকীর বুকটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু সে নিজে স্থির দৃঢ় করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। ধীর পদক্ষেপে সে ঘরে ঢুকল। প্রতীক্ষা করে রইল—পুলিশের আহ্বানের। আহ্বান এল, বাপ হাসিমুখে ব্যস্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন—কেটি শিগগির! শিগগির! কাপড়টা পাল্টে মাথাটা একটু আঁচড়ে আয় মা। মিস্টার মরিসন এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করবেন, ক্ষমা চাইবেন।

কেতকী কাপড় পাল্টালে না, চুল আঁচড়ালে না, সে সেই পোষাকেই এল। বিদ্রোহিনীর মন এবং রূপ নিয়েই এল। মরিসন উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করে সবিনয়ে বললে—আমি সেদিন অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম। আমি জানতাম না যে আপনি ক্রিশ্চান। আমি ভেবেছিলাম কোন হিন্দু মেয়ে, যারা নাকি আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত।

কেতকী তিক্ত হাসি হেসে বললে—কিন্তু তারাও মেয়ে। প্রাপ্য সম্মান তাদেরও প্রাপ্য।

মরিসন ওদিক দিয়েই গেল না। সে বিনত ভাবেই বললে—আপনি বিশ্বাস করুন মিস্ চৌধুরী, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কর্তব্য বড় কঠোর। সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা পুলিশের চাকরি করি কিন্তু আমারাও মানুষ। কঠোর পরিশ্রম, নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা—এ যে কি বিরক্তিকর আপনি অনুমান করতে পারবেন না মিস্ চৌধুরী। আর আমরা কি করব? হিন্দু মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—তারা কনভোকেশনে গুলী ছোঁড়ে। হয়তো এমন মেয়ে হাজারে একটা কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হয় হাজার জনের উপরেই। হাজার জনের যে কেউ ও একজন হতে পারে।

কেতকীর বাপ মরিসনের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কেতকীর মা চা কেক টোস্ট ডিম এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিলে। মরিসন বললে—মিস্ চৌধুরী ক্ষমা না করলে আমি খাব না।

কেতকীকে ক্ষমা করতে হল। শুধু তাই নয় ওই এক প্লেট থেকে খাবারের অংশ নিতে হল। মনে মনে স্বীকার করতে হল মরিসনের যুক্তিকে। এমন মেয়ে হাজারে হয়তো একটা কিন্তু ওদের যে নজর রাখতে হয় হাজার জনের প্রত্যেকের উপর, সন্দেহ করতে হয় প্রত্যেককে। হাজার জনের যে কেউ ওই একজন হতে পারে।

মরিসন গল্প বলে আসর জমিয়ে তুললে। স্বল্পকালের পুলিশ জীবনের কয়েকটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প বললে সে। চমৎকার গল্প বলতে পারে তরুণ পুলিশ কর্মচারীটি। শুধু তাই নয়—পরদিন সন্ধ্যায় মরিসন পুলিশের পোষাকে না এসে সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে ওদের বাড়ী এসে প্রমাণ করে দিলে সে প্রিয়দর্শন তরুণ।

মরিসন সেদিন অকপটে স্বীকার করে গেল কেতকীর মত তেজস্বিনী মেয়ে সে বিলাতে খুব কম দেখেছে। এবং তার এই তেজোদৃপ্ততার মধ্যে এমন একটি মনোমুগ্ধকর রূপ আছে যে রূপ অপার্থিব।

ভদ্র ভাবে একটু লজ্জার সঙ্গেই বললে—মিস্ চৌধুরী, আশা করি আমার কথায় কোন

অন্যায় অর্থ আপনি করবেন না। বার বার আমার মনে হয়েছে আমি যদি চিত্রকর হতাম তবে আপনার রূপের সেই মুহূর্তের ছবি এঁকে রাখতাম।

ভাদ্র মাসের বর্ষণমুখর রাত্রির সদ্যফোটা কেয়াফুলের মতই কেতকী স্নিগ্ধ মনোরমা হয়ে উঠল।

তারপর? তারপর কেতকী সাজলে কেটি।

চুল ছাঁটলে বব করে। লিপস্টিক রুজ পাউডারে বেশভূষার ভঙ্গিতে সে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়ে উঠল। ইংরেজীতে কথা বলতে সুরু করলে। কেটির মা-বাপ আশান্বিত হয়ে উঠলেন মরিসনের প্রত্যাশায়। মরিসনের সঙ্গে চৌরঙ্গীপাড়ায় ঘুরতে লাগল কেটি।

হঠাৎ মরিসন দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে একদা জাহাজে চেপে বসল। সকলের অজ্ঞাতসারেই অবশ্য। কেটিরও অজ্ঞাতসারে। কেটি তখন অন্তঃসত্ত্বা। সংবাদ যখন জানলে তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার, কেটির উপরেই ক্ষিপ্ত হলেন। মা কপাল চাপড়ালেন, গাল দিলেন মেয়েকে—মরে যা—মরে যা তুই।

কেটি গেল পুলিশের একজন বড়কর্তার কাছে, ইংরেজ-বড়কর্তা। তিনি বললেন—দেখ আমাদের সব সংবাদ রাখতে হয়। তোমার এবং মরিসনের খবরও আমার অজানা নয়। কিন্তু মেলামেশা ঘোরাফেরা তো তোমার একা মরিসনের সঙ্গেই আবদ্ধ ছিল না মিস্ চৌধুরী! এমন কি বিখ্যাত মুসলমান পুলিশ অফিসার মিঃ সামসুদ্দিনের সঙ্গেও তোমাকে ট্যাক্সীতে ঘুরতে দেখেছে লোকে। তুমি না বলতে পার না।

কেটি পুলিশ অফিসে সংজ্ঞাহীনের মত বসে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবে উঠে চলে এল। প্রতিবাদ করে বললে না—সামসুদ্দিনকে মরিসনই অনুরোধ করেছিল—তুমি অনুগ্রহ করে তোমার গাড়ীতে কেটিকে পৌঁছে দেবে? সামসুদ্দিন বলেছিল—আনন্দের সঙ্গে। কেটি রাজী হয় নি। মরিসন বলেছিল—লক্ষ্মীটি! আমার কাজ রয়েছে। তুমি জান কেটি পুলিশের কত কাজ। গাড়ীতে সামসুদ্দিন তার অভিপ্রায় ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও মুখে কথায় ব্যক্ত করতে সাহস করে নি। কেতকী সংযত ভাবে মহীয়সীর মত বসেছিল।

তারপর?

তারপর—গৃহত্যাগ। তারপর ভ্রূণহত্যা।

তারপর—আত্মগোপন করে নিষ্ঠুর আক্রোশে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মৃত্যু ওকে গ্রহণ করে নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। আদালত ওর কাহিনী শুনে ওকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলে।

তারপর ধাপে ধাপে পিছলে পড়ে কেটি এসেছে এইখানে। ম্যাগীর পাশের ঘরে।

কেটি সেদিন রাত্রে কেতকী হয়ে ফুটে উঠেছিল জামগুহারবারের গঙ্গার কূলের কেয়াফুলের মত—জীবনে এ তার দ্বিতীয় দিন কোটা।

সেদিন কেতকী দিলীপ বোসকে বলেছিল—তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীর দাসীর

মত থাকতে দেবে ?

তুলু বোস বললে—বিমলবাবু, আমি ওকে বলেছিলাম—কেতকী, তুমি আমি এই মহানগরীর বলি। আমাদের ঘর বাঁধার নয়। আমাদের ঘর ভেঙে মহানগরী বাড়ে।

মহানগরীর বলি। বিমলবাবু আমরা মহানগরীর বলি।

তুলু বোসের সেই কথা কটি বিমলের কানে অহরহ বাজতে লাগল। তুলু বোসের কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস ছিল না, মুখের অভিব্যক্তিতেও না, সে বরং হেসেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে তুলু বোসের কণ্ঠস্বর যেন করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠতে লাগল বলে বিমলের মনে হতে লাগল। শুধু তাই নয়, তুলু বোসের কথা কটি যেন মহানগরীর আকাশে বাতাসে কর্মমুখর কলকোলাহলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

নীচে রিক্সাওয়ালাদের আড্ডায় বোধ হয় বচসা চলছে ; ক্রুদ্ধ চীৎকারের মধ্যে সে শুনতে পেলে ওই কথা ! আমরা মহানগরীর বলি।

মেসের ঘরে গান ধরেছে—গানের ভাষা ভাল বুঝা যাচ্ছে না ; চট্টগ্রামের ছেলে, কথায় চট্টগ্রামের টান বড় বেশী ; তবে সুর শুনে মনে হয় কোন উদ্দীপনাময় গানের সুর। বিমলের মনে হল তার মধ্যেও এই কথা কয়টি ধ্বনিত হচ্ছে। 'মহানগরীর আমরা বলি'

ও পাশের বাঈজীদের ঘরে আজ ধনী অতিথি এসেছে। বিকেলবেলা থেকে সমারোহ পড়ে গেছে। হিন্দুস্থানী চাকরটা বিশবার এল উপরে, দোকান থেকে পান, জর্দা, সিগারেট, বেলফুলের মালা, সোডা, লেমনেড, খাবার, বরফের চাঁই কিনে এনে ছাদের এই রান্নাঘর থেকেই ট্রে থালা বের করে সাজিয়ে নিয়ে গেল। সারেঙ্গী বাজছে, তবলা বাঁধা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঙুর নাড়াচাড়া হচ্ছে ; তার মধ্যেও ওই কথা।

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধার তৃপ্তি হেতু বলি চাই—এরা তাই ! একটি ভাববিচলিত মুহূর্তে বিমলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই উপলব্ধি চীৎকার করে উঠল, তারই প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার কলরব কোলাহলের মধ্যে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা। দিবা দ্বিপ্রহরে বিদেশযাত্রার আয়োজন যখন প্রস্তুত—তখন অবুঝ বালিকা কন্যা এসে কাতরভাবে বলল—যেতে দেব না, যেতে নাহি দিব। স্নেহ-কাতরতার পবিত্র বেদনার মুহূর্তে পিতা শুনতে পেলেন ধরিত্রীর আর্তনাদ—যেতে নাহি দিব ; তুচ্ছ তৃণটির জন্যও ধরিত্রীর যে বেদনাময় ক্রন্দন, বিরাট বনস্পতির জন্যও ঠিক সেই ক্রন্দন। এই ক্রন্দন ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যে পরিধির মধ্যে আর কোন ধ্বনি নাই আর কোন অভিব্যক্তি নাই। বিমলের কাছেও মহানগরীর সকল আয়োজন—সমস্ত পরিধির মধ্যে ঠিক তেমনি—আজ এই মুহূর্তে ওই কথাটিই অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

একটা গভীর যন্ত্রণায় সে যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। মনে পড়ল বৎসর কয়েক আগে দেশে একদা রাত্রে গ্রামপ্রান্তে বাউড়ীপল্লীর মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়েছিল সেখানে ; মদ খেয়ে নেশায় উন্মত্ত বাউড়ীদের ঝগড়া হচ্ছিল—লাঠি কাটারী দা নিয়ে ঝগড়া ;

ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করেছিল সে—তার ফলে একজন নেশায় উন্মত্ত বাউড়ী প্রতিপক্ষ ভ্রম করে তার গলা টিপে ধরেছিল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল; সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ল। সে ভেবে পেলে না কোথায় গেলে সে মুক্তি পাবে—শান্তি পাবে।

ভেবে পেলে না, তবু সে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সামনে তার কেটির ঘর, পাশে ম্যাগী একটা কম-জোরের চিমনী জেলে বসে আছে। কেটির ঘরে ইলেকট্রিক কনেকশন আছে কিন্তু ম্যাগীর ঘরে নাই। চিমনীর রক্তাভ আলো ম্যাগীর মুখের উপর পড়েছে, বার্ধক্যের রেখা-জর্জর পাণ্ডুর মুখ ঘোলাটে চোখ। মনে পড়ে গেল কালীপূজার রাত্রি। কার্ত্তিক মাসের শেষ রাত্রে হাড়িকাঠে বাঁধা বলিগুলির কথা। পাটকাঠির লাল আলোর সামনে ভিজে গায়ে অন্যান্য বলির মধ্যে বলির মেষটা ঠিক এমনি চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় রাস্তায়। রাজপথের উপর হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ট্যাক্সী। ট্যাক্সীতে অরুণা আর পিনাকী। হাসি লেগে রয়েছে দুজনের মুখেই। দুজনেই মহানগরীর প্রসাদ পেয়েছে। বিমল মনে মনে মহানগরীকে প্রণাম জানায়।